CONTEMPORARY INDIAN PHILOSOPHY

BA

Fifth Semester

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Nitai Tudu

Assistant Professor, Department of Philosophy, Mohisadal Girls College, Purbo Midnapur

Author/Translator: Abhijit Baccher, Assistant Professor Department of Philosophy, Mohisadal Girls College, Purba Midnapur
Copyright © Reserved, 2018

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বইম্যাপিং
প্রথম একক :	**একক -১**
স্বামী বিবেকানন্দ (কর্মযোগ)	পৃষ্ঠা (1 - 44)
দ্বিতীয় একক :	**একক - ২**
স্বামী বিবেকানন্দ (জ্ঞানযোগ)	পৃষ্ঠা (45 - 56)
তৃতীয় একক :	**একক - ৩**
বি. আর. আম্বেদকর - ১	পৃষ্ঠা (57 - 72)
চতুর্থ একক :	**একক - ৪**
বি. আর. আম্বেদকর - ২	পৃষ্ঠা (72 - 110)

সূচীপত্র

প্রথম একক : **পৃষ্ঠা (1 - 44)**

স্বামী বিবেকানন্দ (কর্মযোগ)

দ্বিতীয় একক : **পৃষ্ঠা (45 - 56)**

জ্ঞানযোগ

তৃতীয় একক : **পৃষ্ঠা (57 - 72)**

বি. আর. আম্বেদকর - ১

চতুর্থ একক : **পৃষ্ঠা (73 - 110)**

বি. আর. আম্বেদকর - ২

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনে প্রচুর চিন্তাবিদদের প্রভব লক্ষ্যনীয়। এর মুল উদ্দেশ্য হল বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে যথার্থ অর্থে অনুধাবন করা। এখানে প্রাচীন রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের অনুপ্রেরণায় সার্বিক ধারনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বইতে স্বামীবিবেকানন্দ ও আম্বেদকরের ধারনা কে আলোচনা করা হয়েছে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একক ১ :: স্বামী বিবেকানন্দ (কর্মযোগ)

গঠন :

১.০. ভূমিকা

১.১. বিভাগের উদ্দেশ্য

১.২. স্বামী বিবেকানন্দ : অতীত জীবন

১.২.১. ব্রাহ্মসমাজে যোগদান

১.২.২ বিবেকানন্দর উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব

১.২.৩. রামকৃষ্ণ মঠের স্থাপন

১.২.৪. একজন ভ্রাম্যমান প্রচারক

১.২.৫. বিশ্বধর্মসভায় অধিবেশ

১.৩. স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা কর্মযোগ

১.৩.১ কর্ম এবং চরিত্রের উপর তার প্রভাব

১.৩.২. নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকে মহান

১.৩.৩. কাজের গোপন রহস্য

১.৩.৪. কর্তব্যের ধারণা

১.৪. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলন

টিপ্পনী

১.০. ভূমিকা :

উনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকাননন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অতীন্দ্রবাদী প্রধান শিষ্য ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তিনি হিন্দু দর্শনের বিশেষত বেদান্ত ও যোগের পরিচয় ঘটান তাঁর কৃতিত্বের দ্বারা তিনি বিশ্বধর্মসভায় হিন্দুধর্মকে প্রধান ধর্ম হিসাবে আস্থাযোগ্য ও সচেনতনতা বৃদ্ধি করেন। বর্তমান ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসভায় তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মকে তুলে ধরেন। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা প্রচারিত ধারণাগুলি এই অংশটিতে

টিপ্পনী

বর্ণিত হয়েছে।

কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ এই চারপ্রকার যোগের মধ্যে কর্মযোগ হল অণ্যতম। এই চার প্রকার যোগের একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্ক না থাকলেও কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ক আছে। এরা বিশ্বের সমস্ত মানুষের বিভিন্ন ধরণের মনের মধ্যে যুক্ত হয়, কিন্তু প্রায়ই তাদের আচরণগত মিলের জন্য অনেক ধরণের মানুষ লক্ষ্য করা যায়।

যোগগুলির বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের দ্বারা একে অপরের সঙ্গে পার্থক্য করা যায়। সকল যোগের মূল লক্ষ্য হল জগৎ থেকে স্বাধীনভাবে আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ। কর্মযোগ সেই যোগকর্মকেই নির্ধারণ করে যার শিক্ষা আমরা ভগবৎগীতা থেকেই পাই। এর অর্থ ব্যাক্তি তার নিস্কাম কর্মের দ্বারাই পরিপূর্ণতা অর্জণ করে।

এই বিভাগে কর্মযোগের ধারণাটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। একজন কর্মযোগীর অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য এবং দুঃখ মুক্তির পথকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এরই সঙ্গে কতর্ব্যের ধারণা এবং নিয়ম ও স্বাধীনতার ধারণা আলোচিত হয়েছে।

১.১. বিভাগের উদ্দেশ্য :

বিভাগটি পড়ার পর তুমি অবশ্যই বুঝতে সক্ষম হবে -

আধুনিক ভারতে বিবেকানন্দকে একজন দার্শনিক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে সক্ষম হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের ধারণা সুস্পষ্ট হবে।

একজন কর্মযোগী যে কর্মযোগ অনুশীলন করে, তার ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে।

সেইসব পন্থা ও পথসকল যার দ্বারা একজন স্বতন্ত্র মানুষ তার দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তি পায় এগুলি বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।

ভগবতগীতার প্রসঙ্গ সম্বন্ধীয় কর্তব্যের সার্বিক ধারণা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।

নিয়ম ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।

১.২. স্বামী বিবেকানন্দ : পূর্ব জীবন

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি ক্যালকাটায় (অধুনা কলকাতা) জন্মগ্রহণ করেন, এক ঐতিহ্যবাহি কায়স্থ পরিবারে এবং তার পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাল্যকাল হতেই নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল এবং তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেমন - দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য এবং অণ্যান্য বিষয়ে বৃত্তি পান। তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়, হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি যেমন - বেদ, উপনিষদ, ভগবত গীতা এবং রামায়ণ ও মহাভারত ও পুরাণসমূহের প্রতি। এমনকি তিনি যখন যুবক ছিলেন তখন তিনি প্রশ্ন করতেন বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস ও কুঃসংস্কারের প্রতি। ধর্ম হতে সৃষ্ঠ হওয়া পৃথকতা এবং তিনি নিজে বুদ্ধিদীপ্ত প্রমাণ ছাড়া ও হাতেনাতে প্রমাণ ছাড়া কোনোকিছু বিশ্বাস করতেন না।

১৮৭৭ সালে দুইবছরের জন্য নরেন্দ্রনাথের পরিবার রায়পুরে স্থানান্তরিত হন। সেখানে কোনো ভালো স্কুল ছিল না, নরেন্দ্রনাথের এই সময়টি কেটেছে তার পিতামাতার কাছে আধ্বাত্মবিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে। প্রথমই তাঁর মনে ঈশ্বরেদর অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। ১৮৭৯ সালে তাঁর পরিবার আবার কলকাতায় ফিরে আসে। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে এই দুটি করেই তাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

১.২.১. ব্রাহ্মসমাজে যোগদান :

নরেন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা নিজগৃহেই শুরু করেন। পরে তিনি ১৮৭১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং একইসঙ্গে সাধারণ ধর্মসভা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হন। এই বছরগুলির মধ্যেই তিনি ইউরোপের ইতিহাস পড়েন এবং একইসঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তি ও দর্শনও পড়েন, একই সঙ্গে ডেভিড হিউমের লেখা, ইমানুয়েল কান্টের লেখা, অগাস্টান কামটের লেখা, হারবার্ট স্পেনসারের লেখা, স্টার্ট স্টুয়ার্ড মিলের লেখা এবং ডারউনের লেখা তিনি পড়েন।

নরেন্দ্রনাথের প্রাথমিক বিশ্বাস গঠিত হয় ব্রাহ্ম ধারণার উপর যা আকারহীন ঈশ্বরের উপর এবং উপাস্য বস্তুর গম্ভীরতার উপর সংযুক্ত ছিল। তিনি নিজের দর্শনের

টিপ্পনী

জ্ঞানের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না । তিনি অবাক হতেন একজনের অভিজ্ঞতা ও আন্তঃধারণার দ্বারা কিভাবে ঈশ্বর ও ধর্ম একটা অংশ হয়ে উঠতে পারে। নরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক কলকাতার বীশিষ্ট বাসিন্দাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে আরা কি ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়েছেন কিন্তু তাঁর কোনো সন্তোষজনক উত্তর তিনি পাননি।

টিপ্পনী

রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাহিত্যে আলাপচারিতা আরম্ভ হয় একটি সাহিত্যের সভায়, যা ছিল একটি সাধারণ জনসভা। যখন অধ্যক্ষ সম্মানিত হচ্ছিলেন W. Hastie তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন যদি তারা বোধি বা সম্মোহ সম্পর্কে হানতে চায় তাহলে তাদের রামকৃষ্ণের কাছে যাওয়া উচিত। তারা নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।

১.২.২. বিবেকানন্দের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব :

রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ এইরূপ ছিল -

" প্রভুর স্পর্শ যাদুর মতোন কাজ করল, আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আনল, আমি অবাক হলাম যে এই বিশ্বপৃথিবীতে ভগবান ছাড়া কিছুই নেই। সবকিছুই আমি ব্রাহ্মণ দেখতে লাগলাম আমি অনুভব করতে পারলাম যে আমি অদ্বৈত অধ্যায়ের ছোঁয়া পেয়েছি। এটা আমাকে এতটাই আঘাত করল যে আমি বুঝতে পারলাম বইতে লেখাগুলি ভুল নয়। সেখান থেকে আমি কোনদিনই অদ্বৈত দর্শনের উপসংহার বা শেষ বিবৃতিকে অস্বীকার করতে পারিনি।

১৮৮১ সালে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎই তাঁর জীবনের নতুন দিগন্তের সূচনা করে। তাঁর সাফল্য সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ যদি একজন সাধারণ মানুষের মতোন দেখতে এবং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। ব্যবহার করতেন সবচেয়ে সাধারণ ভাষা আমি ভাবতাম যে এই মানুষটি কি একজন মহান মানুষ হতে পারে। আমি তাঁর কাছে প্রায় হাতে ভর করেই গেলাম ও জিজ্ঞাসা করলাম যা আমি আমার জীবনের অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি - আপনি কি ভগবানে বিশ্বাস করেন, তিনি বললেন 'হ্যাঁ'। আপনি কি এটা প্রমাণ করতে পারবেন - "হ্যাঁ"। কিন্তু কেমন করে? কারণ আমি তাকে দেখি ঠিক যেমন আমি তোমাকে এখানে দেখছি শুধুমাত্র উপলব্ধির ব্যাপার। এটা আমাকে খুব অভিভূত করেছে। এরপর আমি দিনের পর দিন আসা শুরু

করলাম এই মানুষটির কাছে এবং আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করলাম যা তিনি দিতে চেয়েছিলেন। একটা স্পর্শ। একটা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত করে দিতে পারে একটি সমগ্র জীবনকে।"

একদম প্রথমে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে তার গুরু হিসাবে গ্রহণ করেননি - তিনি সবসময় তাঁর মতাদর্শের বিপক্ষে যেতেন কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি তাঁর ব্যাক্তিত্বের দ্বারা আকর্ষিত হন এবং তাঁর সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতে শুরু করলেন। ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হওয়ার জন্য তিনি মূর্তিপূজা ও বহু ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে সেচ্চার হয়ে ওঠেন সেইসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণের কালী উপাসনার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করেন। এমনকি তিনি বেদান্তের পরিচয়কেও অস্বীকার করেন পাগলামির অতিরঞ্জকতা হিসাবে।

যদিও নরেন্দ্রনাথ একদম প্রথমে রামকৃষ্ণ এবং তাঁর মতামতকে গ্রহণ করতে পারেননি কিন্তু তিনি তাঁর মত্যমতকে একদম মান থেকে উড়িয়াও দিতে পারেননি। এটা নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতেই ছিল যে পরীক্ষা নীরিক্ষা না করে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে নেই। তিনি রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করতেন যিনি কখনোই নরেন্দ্র নাথকে তাঁর যুক্তিবাদী মনস্কতাকে ত্যাগ করতে বলেননি এবং তিনি নরেন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তি ও পরীক্ষাকে ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা উত্তীর্ণ হন। পাঁচবছরের রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব জীবনে নরেন্দ্রনাথ যিনি অতীতে অস্থির, হতবুদ্ধিকর, উৎভ্রান্ত, অধৈর্য্যবান যুবক ছিলেন - তিনি ভগবানের মস্তিস্ক খোঁজার জন্য সবকিছুই ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। একসময়ে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে গুরু বলে মেনে নিলেন - তিনি নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পন করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষসময়ে বিবেকানন্দ ও কিছু শিষ্যগণ রামকৃষ্ণের কাছ থেকে গেরুয়া সন্যাস বস্ত্র গ্রহণ করেন এবং রামকৃষ্ণের নির্দেশে প্রথম সন্যাসী গঠিত হয়। বিবেকানন্দ চিন্তা করেছিলেন যে মানুষ সেবাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বর সেবা। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বলেছিলেন যে অণ্য সকল শিষ্যদের প্রতি যত্নবান হতে এবং তাদের পরিচালনা করতে।

১.২.৩. রামকৃষ্ণ মঠের উৎপত্তি :

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ তাঁর নেতৃত্বে সন্যাস শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গার নিকটবর্তী বরানগরে এক অর্ধভাঙ্গা বাড়ীতে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। এই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভবনটি ছিল শিষ্যদের প্রথম আশ্রম, এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে শিষ্যরা সন্ন্যাসধর্মের নিয়মগুলি পালন করতে শুরু করেন।

নরেন্দ্রনাথ ও মঠের অণ্য শিষ্যরা প্রায়ই বিভিন্ন ধরণের দার্শনিক আলোচনা এবং রামকৃষ্ণদেব, শংকর,রামানুজ, যিশুখ্রীষ্ট বিভিন্ন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যাক্তির আদর্শে আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণ ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। ১৮৮৭ সালের শুরুতে নরেন্দ্রনাথ ও আটজন শিষ্য সন্ন্যাস ধর্মের নিয়ম নিষ্ঠা পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতীতজীবন পরিত্যাগ করে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস জীবনে "স্বামী বিবিদিশানন্দ" নামটি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্ষেত্রের মহারাজ অজিত সিং তাঁকে 'বিবেকানন্দ' নামে ভূষিত করেন।

১৮৯৯ সালে জানুয়ারি মাসে মঠটি বেলুরে স্থানান্তরিত হয়।

১.২.৪. প্রচারের জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা :

১৮৮৮ সালে বিবেকানন্দ সন্ন্যাস পরিব্রাজক হয়ে হিন্দু ধর্মীয় জীবন প্রচার করতে বিভিন্ন স্থানে কিরণ করেন। তাঁর একমাত্র নিজস্ব বলতে ছিল কমন্ডুল বা জলপাত্র; লাঠি এবং তাঁর দুটি প্রিয় বই ভগবতগীতা ও দ্যা ইমিস্টেপন অফ খ্রীষ্ট (The Imitation of Christ) । নরেন্দ্রনাথ পাঁচ বছর ধরে ভ্রমণকালে বিভিন্ন শিক্ষণীয় স্থান পরিদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। আপামর জনগণের দুঃখ কৎয়ঠ দেখে তিনি দেশকে উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতেন এবং পদব্রজে সমগ্র দেশ পরিদর্শন করেন। ভ্রমণকালে তাঁর অনুগামীরাই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ট্রেনের টিকিটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতেন।

হিমালয় ভ্রমণের সময় বিশ্বব্রহ্মান্ড ও ক্ষুদ্র জগতের দৃষ্টি অনুযায়ী তাঁর মনে জ্ঞানযোগের শীক্ষা প্রতিফলিত হয় যে শিক্ষা তিনি পাশ্চাত্যে বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রদান করেন। ১৮৯১ সালের জানুয়ারীর শেষে তিনি জয়পুর পৌছান সেখানে সংস্থৃত পন্ডিত পানিনির দ্বারা আস্থাধায়ী সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন।

তিনি একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়েও আমেদাবাদ ও পোরবন্দর এসে নয়মাস স্থায়ী হন। কেননা তিনি তাঁর দর্শনচিন্তা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে বিখ্যাত পন্ডিতবর্গদের দ্বারা

আর সমৃদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। এক ধর্মীয় পন্ডিতের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি বেদের অনুবাদ করেন।

১৮৯২ সালে খ্রীষ্টমাসের প্রাক্কালে বিবেকানন্দ দক্ষিণভারত ভ্রমণের সময় কণ্যাকুমারী পৌছান। কন্যাকুমারিতে স্বামীজী Last bit of Indian Rock এর উপর তিনদিন ধরে ধ্যানমগ্ন হন। যেটি পরবর্তি সময়ে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল নামে পরিচিত হয়। যেখানে তিনি ভারতের দর্শন (Vision of one India) উপলব্ধি করেন। যা পরে কণ্যাকুমারী রিজলভ্ অফ ১৮৯২ নামে পরিচিত হয়।

তিনি কেপ ক্যামিরণের মাদার কুমারীর মন্দিরের মধ্যে Last Bit of Indian Rock এ বসে লিখেছিলেন - আমি একটি পরিকল্পনা করেছিলাম। আমরা এখানে অনেক সন্ন্যাসী মিলে ঘুরে ঘুরে মানুষের মধ্যে অধিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞন বিতরন করেছি এগুলিছিল নিছক পাগলামি। আমাদের গুরুদেব আমাদের বলতেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। আমরা মানুষ জাতি হিসাবে আমাদের ব্যাক্তিত্ব হারাই যা মানুষের অবনতির মূল কারণ। আমাদের উচিত ভারতের জনসাধারণকে জাগ্রত করা।

টিপ্পনী

১.২.৫. বিশ্বধর্মীয় মহাসভা :

১৮৯২ সালের প্রথমদিকে বিবেকানন্দ বিশ্বধর্মীয় মহাসভার কথা শ্রবণ করেন এবংতাঁর অনুগামীরা এখানে যোগদানের জন্য তাঁকে আহ্বান জানান। তাঁর শিষ্যরা আমেরিকা যাওয়ার জন্য অর্থসংগ্রহ করেছেন এবং ৩১ শে মে ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগো যাত্রা করেন।

আমেরিকায় পৌছানোর পর স্বামীজি শোনেন যে বিশ্বের ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরিচয়পত্র ছাড়া ধর্মীয়সভায় প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য হবে না। তখন হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট (John Henry Wright) শোনেন যে; স্বামীজীর মহাসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কোনো পরিচয় পত্র নেই। রাইট তখন যা বলেছিলেন - আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া মানে সূর্যের কাছে তাঁর কিরণদানের অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। প্রতিনিধিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি কে রাইট সাহেব একটি পত্র লিখে পাঠালেন যে, এখানে একজন ব্যাক্তি উপস্থিত হয়েছেন যিনি সমস্ত অধ্যাপকদের থেকেও সুশিক্ষিত।

টিপ্পনী

ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা শুরু করেন - ‘‘আমেরিকার ভগিণী ও ভ্রাতৃসমূহ’’ এই শব্দগুলি শোনার পর সাতহাজার মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি দেশের সমস্ত কনিষ্ঠদের এই বলে অভিবাদন করেন যে এই পৃথিবীতে সন্ন্যাসীদের সবচেয়ে প্রাচীন আদেশ হল বৈদিক আদেশ একটা ধর্ম যা পৃথিবীকে সহ্যশক্তি ও সার্ব্বজনীন গ্রহণতা প্রদান করেছে। তিনি এই ক্ষেতে দুটি পন্থার কথা ভগবৎগীতা হতে উল্লেখ করেছিলেন - যেমন বিভিন্ন নদী যা ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তিস্থল হতে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে - ঠিক তেমনিভাবে হে বিশ্ববিধাতা যে বিভিন্ন ধারণার দ্বারা তাড়িত হয়ে - সেগুলি সব তোমাতে গিয়েই মিলিত হয়। এবং সেভাবে বা যেরুপে আমার কাছে আসুক না কেন - আমি সেই নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে তাঁকে সাহায্য করি। সমস্ত মানুষ যুদ্ধ করছে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় যা শেষপর্যন্ত আমার দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও এটা ছিল সামান্য বক্তৃতা কিন্তু সমস্ত জনসভাকে উদ্বেলিত করে এবং বিশ্বজনসভার অনন্য হিসাবে উপস্থাপিত হয়।

বিবেকানন্দ জনতার উচ্ছৃলতা দেখে ভীষণভাবে আকর্ষিত হন। আমেরিকার বাগ্মিতার জন্য সংবাদপত্রে তাঁকে অভিহিত করা হয় ‘‘বিশ্বজনসভায় মহানতম ব্যাক্তিত্ব হিসাবে’’ এবং ‘‘সবচেয়ে বিখ্যাত প্রভাবশালী মানুষ’’ হিসাবে। বিশ্বজনসভায় তাঁর সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে একটি সাধারণ ব্যাপার যে তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিশ্বজনসভায় বক্তৃতাদানের পরে বিবেকানন্দ দুই বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে বক্তৃতা দান করে বেড়িয়েছে। স্বামীজী বলতেন - আমি কখনোই তোমাদের নতুন ধর্মে দীক্ষীত করতে আসিনি’। আমি চাই তোমরা তোমাদের ধর্মে অবিচল থাক আমি চাই যে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানকারি সে তাই-ই থাকুক শুধু একটু উন্নত পর্যায়ে উপনীত হোক - একজন গ্রেসবাই টেরিয়ান একজন ভালো গ্রেসবাই টেরিয়ানেই উন্নীত হোক। আমি শুধু চাই তোমরা সত্যকে গ্রহণ কর - সত্যের সঙ্গে বসবাস কর। সেই অনেকে আলোকিত হও যা তোআদের মধ্যে আত্মশুদ্ধি ঘটায়। পরবর্তিকালে তিনি নিউইর্য়কে বেদান্ত সমাহ গঠন করেন।

তিনি ইংলন্ডে দুবার ভ্রমণ করতে যান যেখানে তিনি মিস মার্গারেট নোবেলের সঙ্গে পরিচিত হন - যিনি ছিলেন একজন আইরিশ লেডি - পরবর্তীকালে তিনি ভগিনী

নিবেদিতা হিসাবে পরিচিত হন। স্বামীজী ম্যাক্স মিলারের সঙ্গেও পরিচিত হন যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত ভাবাদর্শী ছিলেন - ইনি পাশ্চাত্যে প্রথম রামকৃষ্ণের জীবনী লেখেন।

পাশ্চাত্য থেকে তিনি ভারতীয় কাজকর্ম শুরু করেন তিনি তাঁর অনুগামিদের এবং গুরুভাই সন্ন্যাসীদের উপদেশ দেন - সামাজিক কাজকর্ম সংক্রান্ত অভিযান শুরু করতে প্রতিটি গরীব এবং নীচ শ্রেণির দরজায় গিয়ে গিয়ে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করতে হবে এই ছিল তাঁর নির্দেশ। অবশ্য এর সঙ্গে ভূগোল ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাদের শিক্ষাদান করতে হবে। অলসভাবে বসে থাকলে কোনো দিন ভালোকিছু হতে পারে না - রামকৃষ্ণ বলতেন - "হে ভগবান" - যদি না তুমি গরীবদের ভালো কিছু করতে পারা। ১৮৯৬ সালে সাময়িক পত্রিকাতে যা 'ব্রহ্মভাদিন" নামে মাদ্রাজে পরিচিত ছিল - তা বিবেকানন্দের অর্থে নির্বাহ হত। তাঁর প্রধান উদ্দেশভ ছিল - "সবাইকে বেদান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা"।

টিপ্পনী

অগ্রগতির পরীক্ষা :

১. দর্শনের ক্ষেত্রে কেন স্বামীজী নিজের জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ঠ থাকতে পারেননি ?

২. বিবেকানন্দ রক্ মেমোরিয়াল তাৎপর্য কি ?

১.৩. স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ :

প্রতিটি আত্মা হল সম্ভাব্য ঈশ্বর।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে ঐশ্বরিকভাবে আমাদের লক্ষ্য প্রতিভাত হয়।

এই কাজটি আমরা করতে পারি কর্মের মাধ্যমে অথবা প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে অথবা শরীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে অথবা দর্শনের মধ্যে এইভাবে একের মধ্যে যা অনেকের মধ্যে অথবা সকল কিছুর মধ্যে দিয়ে মুক্তি লাভ হবে।

"এইটিই ধর্মের সারমর্ম। বিভিন্ন মতাদর্শ, মতামত, রীতিনীতি বই মন্দির অথবা আকার হল গৌণ বিষয়।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

টিপ্পনী

কর্মযোগ হল নৈতিকতা ও ধর্মের যা ভালো কর্ম ও পরার্থপর তার দ্বারা স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভের সাহায্যে করবে। এটি সর্বদা প্রয়োজন নয় যে একজন কর্মযোগীকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে অথবা এটা আবশ্যক নয় যে তার আত্মা অধিবিদ্যা তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করতে। ব্যক্তির কর্মের লক্ষ্য হবে পরার্থপরতাকে অনুধাবন করা। ব্যাক্তি জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে অনুধাবন করবে এবং সমাধান করবে একমাত্র কর্মের দ্বারা, যা কোনো মতাদর্শ ও তত্ত্ব হবে না।

প্রতিটি মুহূর্ত যে তার জীবনে উপলব্ধিতে ভরপুর হবে এটি সম্ভব শুধু তার কর্মের দ্বারা এবং এর জন্য তার কোনো মতবাদ বা দর্শনের দরকার নেই। আমরা এই একই ক্ষেত্র দেখতে পাই যখন জননী তার সন্তানের পেছনে প্রত্যেকটি কাজের কারণ ও অণুপ্রেরণা দিতে থাকেন ঠিক তেমনি ভক্তরা তাঁদের গুরুর ভালোবাসার গ্রহণে লালায়িত থাকে।

একজন কর্মযোগীর জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে পৃথিবী সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে। এই ভিত্তইটির মূল গুরুত্ব হল প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ অনুধাবন করা। একমাত্র কর্মের প্তি মনোযোগের মধ্য দিয়ে যে অন্তিম পর্যায়ে উন্নিত হতে পারে।

এই জগতের প্রকৃতি হল অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্য পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্য পূর্ণ জগৎকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য মানুষের মধ্যে সর্বদা প্রচেষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। যদিও র্দন চিন্তা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে জগৎকে উপলব্ধি করতে না পারলেও তাৎক্ষণীক উপলব্ধি করা সম্ভব।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ব্যক্তি কি কখন নিরন্তর আনন্দ পেতে পারে? জগতের সমগ্র ভালো জিনিস মানুষের প্রয়োজন ও লাভের সঙ্গে জড়িত। এটা কখনোও বাড়বে না বা কমবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কেউ মানুষের গতিপ্রকৃতি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করে তাহলে দেখা যাবে সমগ্র মানবজাতি একই ধরণের দুঃখ-কষ্ট, একই ধরণের আনন্দ -ব্যাখ্যা ইত্যাদি ভোগ করছে। সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলি একইভাবে বিরাজমান, সে তারা যে স্থানের হোক না কেন। যদিও এটা লক্ষ্যনীয় যে জগতের বিভিন্ন ধরণের আনন্দ ও দুঃখের কারণকে খুব কমলোকই ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে। মানব ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মানবজাতি সর্বদাই অণ্যদের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য প্রচেষ্ঠারত।

বর্তমানকালে হাজার হাজার মানুষের চাহিদা হল সাম্যের ও স্বাধীনতার প্রতি সমধর্মিতা বজায় রাখা। যদি তারা অন্ধবিশহবাস দ্বারা চালিত, সত্যিকারের সাম্যতা কোন দিন ছিল না আর হবেও না ..... তাহলে মানুষে মানুষে প্রভেদটা কোথায় ? এটি মস্তিষ্ক জনিত পার্থক্য। আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহ করি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা নিয়ে - আমরা আসি মহান মানুষ হিসাবে অথবা সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং আমরা আমাদের সেই জন্মগত পরিবৃত্ত থেকে বার হতে পারি না - সঠিক সাম্যতা তখনই আসে যখন আমাদের মানবজীবনের সম্পূর্ণতা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়।

সহস্র মানুষের ধারণার উপলব্ধির জন্য তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। ঠিক যেমন এই অসাম্যই স্বয়ং সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন তেমনি তার প্রচেষ্ঠার সীমাবদ্ধতারও প্রয়োজন। যদি ব্যাক্তির কোনো প্রচেষ্টাই না থাকে তাহলে সে মুক্ত ও ঈশ্বরের কাছে পৌছাতে পারবে না তখন আর কোনো কিছুই সৃষ্টি হবে না। এখানে দুটি শক্তির পার্থক্য যা মানুষের প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে লক্ষ্য হিসাবে সথির করে। মানুষের বন্ধন এবং স্বাধীনতার প্রতি চালনা করতে ইচ্ছাশক্তিই কর্ম করতে সাহায্য করে।

একজন কর্মযোগী জগতের প্রকৃতিকে অবশ্যই উপলব্ধি করবে এবং নিজেকে তার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত রাখবে। তিনি যদিও আনেন এই জগতের অসাম্যতা সম্পর্কে তথাপি তার ইচ্ছাশক্তি তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হবে। সে যে স্বার্থপর নয় তা তার উপলব্ধি হবে। 'স্বার্থপরতা হল অনৈতিক এবং পরার্থপরতা হল নৈতিক; এটাই একজন সত্যিকারের কর্মযোগীর লক্ষ্য। এই বাহ্যিক শক্তিই তাকে উদ্দীপিত করে কর্ম করতে যা অন্তঃসত্ত্বাকে ভালোবাসায় স্থান করে দেবে। এটা তখনই সম্ভব যখন সত্যিকারের মুক্তির নীতি অংধবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে আমরা গৌতম বুদ্ধের কথা বলতে পারি। তিনি ভগবান কোনো ধারণা প্রচার করেননি বরং তিনি উৎসাহিত করেছেন নিজের জন্য নিজের ভালো করার। তাঁকে মনে করা হয়, তিনি সর্বসময়ের উর্দ্ধে এমন একজন ভালো র্দানিক যিনি দর্শনের অর্ন্তনিহিত মতবাদ প্রচার করে গেছেন। তাঁকে আদর্শ কর্মযোগী বলে মনে করা হয়। কেননা তিনি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই কর্ম করে গেছেন। একজন যোগী হিসাবে তিনিই মহান ব্যাক্তিত্বেরও অধিকারী।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১.৩.১. কর্ম, তার চরিত্রের উপর প্রভাব :

কর্মযোগের বিশ্বাস অণুসারে আমরা যে কাজ করি তা ককনোই নষ্ট হয় না যত সময় তার ফল ভোগ হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ - একজন ব্যাক্তি যদি খারাপ কর্ম করে তাহলে যে ফল ভোগের জন্য তৈরী থাকে পৃথিবীর কোনো শক্তিই এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একইরূপে যদি কেউ ভালোকর্ম করে তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই ভালো ফল লাভ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। 'কর্ম্ম' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ : এতী 'কৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ হল করা। যা কিছু করা হয় তাই কর্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ কর্মফল।

মানুষের জীবনের দুঃখ, কষ্ট মানুষ তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা দূর করতে পারে। অণ্য ধরণের জ্ঞান ও আমাদের দুঃখ কষ্ঠ থেকে মুক্তি দিতে পারে তবে তা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু একমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানই পারে দুঃখ কষ্টকে চিরতরে মুক্তি ঘটাতে। কোনো মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে সাআয্য করাই সবথেকে বড় সাহায্য। মহৎব্যাক্তিগণ যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান কচরে থাকে তখন তাকে ঈশ্বরের দূত বলে মনে করা হয়। আমারা বিশ্বাস ককরি এরাই জগতের সবথেকে ক্ষমতাশালী - ব্যাক্তি খ। এরাই মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে সাহায্য করে এবং আধ্যাত্মিকতাই হলল মানব জীবনে সকল কর্মের মূল ভিত্তি। এই রকম আধ্যাত্মিক সাহায্য না পেলে মানবজীবনে মূল চাহিদা পূরণ হবে না।

আধ্যাত্মিকতার পরেই নিজের বুদ্ধিজনিত সাহায্য ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞান এমন একটি অস্ত্র যা বিশ্বপিতা হতে প্রাপ্ত - যা কোনো খাদ্য বা পোশাকে থেকেও মূল্যবান। এটা মনে করা হয় যে জ্ঞান এমন একটি উচ্চ বস্তু যা মানুষকে জীবনশক্তি দান করে - কারণ একটি প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ। অজ্ঞতা মৃত্যুর সমতুল্য যেখানে জ্ঞানই হল জীবন। জীবনের মূল্য খুবই কম। যদি দুঃখের অনুসন্ধান কে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে জীবন অন্ধকারাচ্ছন্নের মধ্যেই থাকবে। যখন আমাদের জীবন অণ্যকে সাহায্য করার প্রশ্ন আসে , তখন আমরা শুধুমাত্র তাকে শারীরিক / দৈহিক সাহায্য করার কথাই ভাবি - কিন্তু এটা আমরা ভুল করি, এদর একমাত্র কারণ দৈহিক সাহায্য আমাদের কোনভাবেই সন্তুষ্ট করতে পারে না - কারণ এটা হল নূনতম সাহায্য, কিন্তু শেষ সাহায্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ

বলা যায় একজন ক্ষুধার্থ দুঃখী মানুষ যখন যে কিছু খাদ্য পায় তখন সে শান্ত হয় তার এই ক্ষুধার্থতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসে ঠিক তেমি দুঃখ ও আমাদের সকল চাহিদা যখন শেষ হয়ে যাব তখন আসে। আমরা তখনি আমাদের এই রকম (অসাধারণ) জ্ঞান ধারণ করতে সক্ষম যখন কেউ আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতা দূর করতে সক্ষম হবে।

টিপ্পনী

জগতের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে দৈহিক / শারীরিক সাহায্যই একমাত্র প্রয়োজন নয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করছে তত সময় পর্যন্ত দুঃখ চলতে থাকবে । শারীরিক প্রয়োজনীয়তা থাকলেই দুঃখ থাকবে কিন্তু শারীরিক প্রয়োজনীয়তা কোন কাজেই লাগে না। এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে মানুষকে শুদ্ধ হতে হবে। যদি এই জগতকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত করা যায় তাহলে সমস্ত দুঃখ দূর হবে। মানুষকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হতে হবে; চরিত্রের শুদ্ধি ঘটাতে হবে তাহলেই সে আধ্যাত্মিক ভাবে শক্তিশালী হবে এবং শিক্ষিত হয়ে উঠবে আনন্দ নয়, জ্ঞানই হোল মানুষের জীবনে মূল লক্ষ্য। আনন্দ এবং দুঃখ, ব্যাখ্যা ও কষ্ট হল আমাদের শিক্ষক ; তারা আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। আমরা এই বলে শেষ করতে পারি যে আনন্দের থেকে কষ্টই আমাদের চরিত্র রূপায়নের সাহায্য করে।

সমস্ত জ্ঞানই মানুষের অন্তনিহিত, সকল বাহ্যিক ঘটনা উদ্দীপক হিসাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। চকমকে পাথরের মধ্যে যেমন আগুন থাকে তেমন মনের মধ্যে থাকে জ্ঞান। কাজের মধ্যে দিয়েই আনন্দ অথবা কষ্ট আসে। প্রতিটি মানসিক ও দৈহিক কর্ম আত্মার দ্বারাই পরিচালিত। আত্মা থেকে জ্ঞান ও শক্তি আসে। এটাই হল কর্মের মূল প্রকৃতি ও অর্থ।

প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা আমাদের মনে এক গভীর ছাপ ফেলে যায়। কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তের ক্ষেত্রে এই ছাপটি আমাদের আচরণকে নির্ধারণ করে এবং সেই অণুসারে আমরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করি । এইভাবে যে অবস্থায় আমরা জীবন অতিবাহিত করি সেইভাবেই আমাদের চরিত্র তৈরী হয়। আমাদের বর্তমানের চিন্তাই ভবিষ্যৎ কে নির্ধারণ করে। ছোট ছোট ঢেউ মিলিত হয়ে যেমন বড় ঢেউ তৈরী হয় তেমনি ছোট ছোট কাজ নিয়েই কর্ম তৈরী হয় যা আমদের ব্যাক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে এবং তা চরিত্র নামে পরিচিত। স্বতন্ত্র সমাজ ও জাতির বিভিন্ন রকম চাহিদা থাকে সেটা তারা বিভিন্নভাবে

টিপ্পনী

মিটিয়ে থাকে। যদিও সকল স্বতন্ত্র জাতি ও দেশের ক্ষেত্রে চরিত্র গঠনের প্রয়োজন হল সার্বিক প্রয়োজন। যদি আমরা ভালোগুণের চরিত্র প্রদান করি তাহলে মানুষের মধ্যে এমন এক সত্য মানুষ নির্গত হবে যে কেবল নিজের সমস্যার কথা না ভেবে অণ্যের সমস্যারও সমাধান করবে। মানুষকে মনে করা হয় যে যে কেন্দ্রস্থলে আছে এবং সমস্ত শক্তিকে সে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। সেই শক্তিগুলি একত্রিত হয়ে মনের ভিতর থেকে ইচ্ছাশক্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে নির্গত হচ্ছে সেটিকে আমরা চরিত্র বলি। এইরকম চরিত্রের অধিকারি হলেন গোতম বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্ট্র। এই জগতে কিছু মানুষ আছে যাঁরা কাজের জন্য কাজ করেন তারা নাম খ্যাতি ও যশের উর্দ্ধে তাঁরাই হলেন মনীষী। তারা কাছ করেন কারণ সেই কাজ থেকে শুভ ইচ্ছাশক্তি বেদরিয়ে আসে। অন্য কিছু মানুষ আছেন যারা গরীবদের এবং মনুষ্যজাতির উপকার করেন কিন্তু তাদের তাতে উচ্চস্বার্থ থাকে । কারণ তারা বিশ্বাস করে ভালো করলে এবং ভালোবাসলে প্রতিদানস্বরূপ অনেককিছু পাওয়া যায়।নাম ও খ্যাতির পিছনে হোটার নিয়ম অণুযায়ি কদাচিৎ ভালো ফল আসে কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যায় এবং জীবন সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে জীবনও শেষ হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন সর্বদা উঠে আসে স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কোন মানুষ যদি কোন কাজ করে তাহলে সে কি কোন কিছু অর্জন করতে পারে ? এটা আমরা বলতে পারি যে এই ধরণের মানুষই আপামোর মানুষের মনে স্থান করে নেয়। কর্মই কর্মের জন্য এটাই ছিল গৌতম বুদ্ধ ও যিশুখৃষ্টেদর মত মহৎ মনুষদের প্রধান কর্মবানি যার দ্বারা তারা জগতের পরিবর্তন সাধ করে ছিলেন যখন বিশ্ব প্রকৃতি নিজের নাম, খ্যাতি ও পাপের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। নাম ও খ্যাতি এই সমস্ত কাজ চাহিদা মাউষের নৈতিক শক্তিকে নষ্ট করে দেয় জগৎ থেকে কোন কিছু লাভ করার আগেই। কিন্তু স্বার্থ বিহীন কাজ কর্ম ভালোবাসার জন্য ও ভালো করার জন্য করা হয় - এটাই হল ইচ্ছা শক্তি ও নৈতিক শক্তির মেলবন্ধন যাদের মিলনে মহৎ বভাক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে । যদি কোন বাহ্যিক শক্তি স্বার্থের ছায়া পরিচালিত হয় তাহলে তার ফল স্বরূপভালো। কিছু পাওয়া যায় না। যযদি সেই শক্তিকে আমরা সংরক্ষণ করি তবে সেটি আমাদের উন্নতির কাজে লাগবে । অতি নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছাশক্তির উদ্ভব ঘটায় যেমন যিশুখৃষ্ট ও বুদ্ধের মধ্যে অতিসংযম লক্ষকার স্বাথহীনতা ভীষণভাবে আকাঙ্খিত কিন্তু সাধারণ মানুষ স্বাথহীন কাজে মনোনিবেশ করে না, কিন্তু

এটি স্বার্থের পক্ষে লাভ জনক । ভালোবাসা, সত্য ও স্বার্থহীনতাই একমাত্র নৈতিক অলংকার নয় কিন্তু তারা একত্রই উচ্চাদর্শ তৈরী করে তবে এই তিনটি গুণের সংমিশ্রণে মানুষের নৈতিক চরিত্র শক্তিশালী হয়।

কর্ম ও কর্মফল হল ব্যাক্তি চরিত্রের সবথেকে উল্লেখযোগ্য শক্তি, এই শক্তির মূল কেন্দ্রস্থল হল মানুষ, সেখানে থেকে সকল সার্বিক শক্তিকে নজের দিকে আকর্ষণকারী ব্যাক্তি এই সমস্ত শক্তির উদ্ভব ঘটাচ্ছে । যে ব্যাক্তি এই শক্তির উদ্ভব ঘটাচ্ছে সেই হল প্রকৃত মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মনের ওপর ছাপ ফেলে যায়। প্রতিটি কাজ করার সঙ্গে আমাদের দেহের সার্বিক বিকাশও ঘটে। যখন আমরা চিন্তা করি তখন তারা মনের বাইরে নয় মনের গভীরে অবচেতন মনে ছাপ ফেলে যায়। মনের উপর পড়া ছাপটিই আমাদের বর্তমানকে নিরূপিত করে। আমাদের অতীত জীবনের ছাপের ফলই আমাদের বর্তমা জীবন। যদি একজন মানুষ খারাপ চিন্তা করে তাহলে তার কাজের মধ্যে খারাপ প্রতি ফলন ঘটে। সেকানে একজন গুণি মানুষের ভালো চিন্তায় প্রতিফলন তার ভালো কর্মের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। চতিত্রের সত্যতাই হল বভাক্তির খ্যাতিও। যখন চরিত্র ও খ্যাতি একই হয়ে যায় তখনই আদর্শ সত্ত্বার প্রতিফলন ঘটে। গ্রীক শব্দে চরিত্রের অর্থ হল এই পৃথিবীতে কোন সত্ত্বাকে খোদাইও করা চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে বলতে হবে এমন বৈশিষ্ট্য যা একটি মানুষ থেকে আর একটি মানুষকে পৃথক করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল কোনো সত্ত্বার মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী যেটি অভ্যাসগত বা শিক্ষাগত যা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন -

তুমি যা তাই হল চরিত্র - যা ইচ্ছাশক্তিকে উজ্জীবিত করে । তোমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিনিয়িত চালিত কর যা তোমাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে।ইহাই হল সর্বশক্তিমানতা। ইহাই হল চরিত্র যা কঠিন প্রাচীরকে বিদীর্ণ করে। এবং এর পরে তিনি চরিত্র সম্পর্কে যা নির্দেশ করেন তা হল কোনো মানুষের চরিত্র হল তার বিভিন্ন আচরণের সমষ্টি। আমাদের চিন্তাভাবনাই আমাদের তৈরী করে। স্থায়ি চিন্তাভাবনা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। সেই জন্য তোমরা যা চিন্তাকর তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত ।ন প্রত্যেকটা কাজ যা আমরাকরি প্রতিটি চিন্তা যা আমরা ভাবি সেগুলি আমরা প্রত্যেক

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুহূর্তে নির্ধারণ করি তার সবকিছুর ছাপ আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। প্রতিটি মানুষের এই চরিত্র নির্মিত হয় এই সমস্ত ছাপ দ্বারা। যদি ভলো ছাপ থাকে তাহলে চরিত্র গুণী বা ভালো আর যদি খারাপ ছাপ থাকে তাহলে চরিত্র খারাপ হতে বাধ্য। একটি প্রশ্ন সর্বদাই উল্লিখত হয় যে শান্ত - নিঃশ্বব্ধ ও নিজ নিয়োজিত হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক সংযম কোথায় ? - যা মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্তিতে সাহায্য করবে। উত্তরটা হল মানুষকে অবশ্যই শিখতে হবে। নির্জনতাকে অনুসন্ধান করতে - নিঃস্তব্ধতার মধ্যে থেকে। উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ একটা বড় কোললাহলপূর্ণ রাস্তার মধ্যে দিয়ে যায়এবং তার মন যদি শান্ত থাকে যেনটি একটি গুহার মধ্যে থাকলে হয় যেখানে কোনো শদই তার কাএ পৌছাবে না তাহলে যে সর্বদাই খুব একাগ্র চিত্তে কাজ করবে। ইহাই হল প্রকৃত কর্মযোগ এবং যদি তুমি এগুলো অর্জন কর তাহলে তুমি কর্মের প্রকৃত সত্য জানতে পারবে।

আমাদের সকল কাজ ও অনুভূতিতে থাকে আমাদের চোখের জল ও আমাদের হাসি, আমাদের আনন্দ ও আমাদেদর কষষ্ঠ আমাদের আনন্দ এবং খুশী, আমাদের অভিশাপ এবং আশীবাঁদ, আমাদের দোষ ও গুণ এর প্রত্যেক কিছুই আমরা লক্ষ্য করি আমাদেদর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। যেগুলি অনেক আঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা নিয়ে চলেছি। এর ফল হল আমরা কি ? এই সকল অভিঘাতগুলোকেই আমরা একই সঙ্গে কর্ম বলি যা কাজের সঙ্গে সংযুক্ত।

১.৩.২ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান :

কর্মযোগের সর্ব্বোচ্চ ধারনাটি কখনই একজন মানুষকে নিরুৎসাহিত করা বা ঘৃণা করা উচিত নয় যে তার মূল লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। এমনকি সর্বনিম্ন কাহাকেও নিন্দা করা উচিত নয়। ধরা যাক কোনো মানুষ নিজের নাম এবং যশের জণ্য স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কোনো কাজ য়োঝে না কিন্তু প্রতিটিমানুষের উচিত ঐ ব্যাক্তিকে বোঝা এবং উচ্চলক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা করা।

শিক্ষাদানই হল অণ্যতম মহান আদর্শ। অসৎকে প্রতিহত না করা এবং এর অর্থ হল কোনো কিছু ঘৃণা অথবা হিংসা থেকে নজেকে বিরত রাখা। শিক্ষাদানের পূর্বে মানুষের প্রযোনজ্য হল বিভিন্ন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানো। এইগুলি ছাড়া অপ্রতিরোধ

একটি ভীতিজনক কাজ হিসাবে গণ্য হয়। এইসব মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম নিয়ম হল তার মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা। যদিও এটাকে প্রথমে ব্যবহার করা উচিত তারপর যে তার শক্তিকে নিরাপদ করে তুলতে পারবে। এইভাবেই তার উচ্চ আদর্শগুলির অণুশীলন করবে। কর্তব্য ও নৈতিকতা বিভিন্ন মানুষের 'মানসিকতার' অণুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়েথাকে। ক্রমোন্নতির পর্যায়ের দ্বারাই তাদের ক্ষমতা নির্মিত হয়। তার পরবর্তী পর্যায়ে উন্নতির প্রয়োজন যদিও এটাই তার অন্তিম পর্যায় নয় এইগুলির অণুধাবন না করলে এটা হবে অণেক মানুষকে ঘৃণা করা। এটি শুধু তাই নয়, সবসময় মানুষকে অনুভব করা যে তারা সবসময় ভুল করছে এর ফলে তার প্রত্যেকটি কাজে সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায় এবং এটি তাকে দুর্বল করে দেয়। এবং সেই নিরন্তর আত্মসমর্থন অনেক দোষের জন্ম দেয় সেই মানুষটার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য যে যে মানুষটি নিজেকে ঘৃণা করা শুরু করছের তার অবশরের পথ প্রশস্ত হয়েছে। সত্যটি একটি দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সংখ্যা দর্শন অণুসারে মানুষের দেহ ও মন গঠিত হয় প্রকৃতির সত্য, রজঃ, তমঃ এই তিন প্রকার উপাদানের সমতার দ্বারা। মানুষের চরিত্র নৈতিকতার নির্ভর করে তিনটি উপাদান পারস্পরিক প্রভাবে দ্বারা, তমঃ- অক্ষমতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন তাকে নির্দেশ করে, রজঃ রাগ বা আকর্ষন করে এবং সত্য, রজঃ ও তমের মধ্যে সাম্যতা বজায় রাখে।

এই তিনটি উপাদানই প্রতিটি মানুষের মধ্যে বর্তমান যখন তমঃ গুণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তখন মানুষের মধ্যে আলখ্য ও অক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। আবার যখন রজঃগুণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তখন মানুষ কর্মক্ষম হয়ে ওঠে এবং সত্য এদের দুটিরমধ্যে সমতা বজায় রাখে, এক এক মানুষের ক্ষেত্রে এক একটি গুন প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সেই অনুসারে কোন মানুষ অলস, অক্ষম আবার কোনো মানুষ সক্রিয় কর্মঠ হয়ে ওঠে। এই পৃথক গুণের মধ্যে একটি গুণ প্রকৃতির মিষ্ঠতা, নিস্তব্ধতা, ভদ্রতা দর্শন করে সেই সত্যই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় তারমধ্যে সমতা বজায় রাখে। বিভিন্ন গণের মধ্যে একটি গুণের সৃষ্ঠির সাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেমন গাছ ও প্রানী।

তিনপ্রকার ঘটনা কর্মযোগের ধারনাকে বন্টন করে। এটা আমাদের ভালো কাজ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। মানব সমাজ এক পর্যায়ক্রমিক প্রতিষ্ঠান। যদিও আমরা কর্তব্য ও নৈতিকতাকে জানি তবুও এই নৈতিকতার ধারণাটি এক ত্রক দেশে এক এক রকম। নৈতিকতার মূল্য এক এক দেশে এক এক রকম। নৈতিকতার মূল্য এক এক

টিপ্পনী

দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তুলনা করা হয়। যেমন কোনো দেশে পরিবারের মধ্যমে বিবাহকে নৈতিক বলা হয় আবার কোন দেশে এটি অনৈতিক।

একইভাবে কর্তব্যেদর ধারনার ও পার্থক্য আছে। যেমন কোন একটি দেশে যদি একজন মানুষ কর্মসম্পাদন করতে না পারে, তাহলে তাকে অনায্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, আবার যদি সে ঐ কাজটিন সম্পাদন করে তাহলনে কিছু মানুষ তাকে ভুল বলনে। যদিও আমরা জানি কর্তব্যের একটি সার্ব্বজনীন ধারণা আছে। একইভাবে কোনো সামাজিক গোষ্ঠী যদি কোন বিষয়কে কর্তব্য বলে মনে করে অনভন আর এক গোষ্ঠী সেই বিষয়কে কর্তব্যের অংশ বলে মনে করে না। এখানে দুতি পথ যোগ্য - অজ্ঞ বা মূর্খ গোষ্ঠিদের ক্ষেত্রে এর সমাধান হলল নিজেদের মতামত যা সর্ব্বোচ্চ সত্য বলে মনে করে অন্যদের মিথ্যা বলে গণ্য করা। জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে আবার অন্য সমাধান যদি কোন মানুষ কর্তব্য ও নৈতিকতার ধারণাকে অঞ্চল ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন মনে করে তবে একই ভাবে তাদের ক্ষেত্রে সেই ঘটনার অণুধাবন করা গুরত্ব আছে। কোনো রাজ্যের কর্তব্য যদি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তাহলে তা অণ্যের সঙ্গে এক হয়ে না।

অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ধর্মীতিতে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতির মূলে আছে প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্য, রজঃ, তমঃ এর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের সামনে ভালোভালো গুণের উপস্থাপন করা যেগুলি বিভিন্ন ধরণের মানুষেরা বিবতর্ণের পর্যায় অনুযায়ী গ্রহণ করবে। বিভিন্নন আশ্রম অণুসারে জীবনের প্রত্যেক স্থরে বিভিন্ন কর্তব্য উপদিষ্ট হয়েছে। এই আশ্রম গুলির মধ্যে কোনটিইন অপরাধ থেকে বড় নয়। যিনি বিবাহ না করে ধর্মকার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে তাঁর জীবন তত মহৎ, বিবাহিত ব্যাক্তির জীবনও তত মহৎ। সিহাসনে আবার রাজা যেরূপ মহান ও গৌরবান্বিতরাস্তার ঐ ঝাড়ুদার ও সেইরূপ। রাজাকে তার সিংহাসন থেকে তুলে ঝাড়ুদারের কাজ করতে তিনি কতটা পারেন। আবার ঝাড়ুদারকে নিয়ে সিংহাসনে বসান - দেখ সেই বা রাজধর্ম কিরুপে চালায়। সংসারী অপেক্ষা সংসার ত্যাগী মহত্তর একথা বলা বৃথা সংসার হতে স্বতন্ত্র থেকে স্বাধীন সহজ জীবনযাপন - সংসার থেকে ঈশ্বর উপাসনা করা অনেক কশিন কাজ।

যখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করল - 'এখন আমি আমার কর্তব্য সম্পর্কে দিশাহারা এবং আমার ক্ষুদ্রদৃষ্টি দুর্বলতার জন্য ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। এই রকম

টিপ্পনী

পরিস্থিতিতে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি তুমি নির্দিষ্ট করে বল আমার জন্য ভালে কি হবে ? এখন আমি তোমার শিষ্য এবং আমার আত্মাকে তোমার সমপর্ণণ করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে নির্দেশ দাও। (ভগবতগীতা - ২১৭)

যেমন বিষ্ণু তার উত্তর নির্দিষ্ট করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের কথা বলেন সূর্যদেবতা এবং সূর্যদেবতা তাঁর ছেলে বিশ্বত্মা মনুকে বলেন এবং এইভাবে চলেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি হারিয়ে যায়। পরবর্তি সময়ে তিনি এই গোপন যোগের কথা শুধুমাত্র অর্জুনকে বলেন।

ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কাপুরুষ ও কপট বলেছেন, কেননা বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব ছিলেন এবং 'অহিংসাই পরম ধর্ম, এই অজুহাতে অর্জুন তখন যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে চান। এখানে একটি প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম দুটি প্রান্ত থাকে যা দেখতে একইরকম। চূড়ান্ত অস্তু ও চূড়ান্ত নাস্তি সকল সঞ্চয় সদৃশ। আলোককম্পন যখন অতি মৃদু তখন তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়না, অতিদ্রুত কম্পন ও আমরা দেখতে পাইনা। শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ অতি নিম্ন গ্রামের শব্দ শোনা যায় না অতি উচ্চ গ্রামেদর শব্দও শোনা যায় না। প্রতিকার ও অপ্রতিকারের প্রভেদ ও এইরুপ।

মানুষ প্রতিনিয়নত প্রতিরোধ ও সপ্রতিরোধের - সংগ্রাম করে চলে। উদাহরন স্বরুপ একজন কোনো অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কারণ যে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম। আর একজন জানে যে ইচ্ছা করলে সে দুর্ণিবার আগাত হানতে পারে। তথাপি যে শুধু যে আগাত করে না তা নয় বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যাক্তি দুর্বলতাবশতঃ প্রতিকার করে না যে পাপ করছে। সুতরাং এই অপ্রিতকর হতে যে কোনো সুফল অর্জন করতে পারে না পক্ষান্তরে অপর ব্যাক্তি যদি প্রতিকার করে তবে পাপ করবে।

যুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করলেন এটা প্রকৃত ত্যাগ, কিন্তু যার ত্যাগ করার কিছুই নেই একন ভিক্ষুকর কাছে ত্যাগের কোনো কখনই উঠতে পারে না। অতএব এই অপ্রতিকর ও 'আদর্শ প্রেমের' কথা বলার সময় আমরা প্রকৃত পক্ষে কি বুঝেছি সেই দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। আগে যত্নসহকারে বুঝতে হবে প্রতিকার করার শক্তি আমার আছে কিনা। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকারের চেষ্টা শূন্য হয় তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের কাজ করছি; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের

টিপ্পনী

শক্তি না থাকে এবং নিজেদের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্রেরণার কাছ রুচি তবে আমরা ঠিক তার বিপরীত আচরণই করছি। অর্জুন ও তাঁর বিপক্ষে প্রবল ঘৈন্যবূহ সজ্জিত দেখে ভীত হয়েছিলেন। 'স্নেহ ভালোবাসা' বশতঃ তিনি দেশের ও রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলে গেছেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে কপট বলেছেন।

টিপ্পনী

পন্ডিতের মতো কথা কলহ অথচ কাপুরুষের মত কাজ করছ, ওঠ দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।"

এটাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানের অপ্তিকারই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ - তিনি আরও জানেন যে, ইহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ এবং অন্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকররূপ - শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের সোপানমাত্র। এই সর্ব্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হওয়ার পুর্য়ে মানুষের কর্তব্য অশুভের প্রতিরোধ করা। কাজ করতে হবে সংগ্রাম করতে হবে যতদূর সাধ্য উদ্যম প্রকাশ করে আঘাত করতে হবে। এই প্রতিকারের শক্তি আরও হয়েছে তাঁর পক্ষেই প্রতিকার ধর্ম বা পূর্ণকর্ম।সর্বপ্রকার আলস্য ত্যাগ করতে হবে। ক্রিয়াশীলতা অর্থে সর্বদাই 'প্রতিরোধ' বুঝিয়ে থাকে। মানসিক ও শারীরিকন সর্বপ্রকার অসদভাবের প্রতিরোধ কর, যখন তুমি এই কার্য্যে সফল হবে তখন শান্তি আসবে। একথা লা অতি সহজ যে, "কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কোন অমঙ্গলের প্রতিকার কর না" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর কি অর্থ দাঁড়ায় তা আমরা জানি। যখন সমগ্র সমাহোর চক্ষু আমদের দিকে, তখন আমরা অপ্রতিকারের ভাব দেখতে পারি। কিন্তু বাসনা দিনরাতি দূষিত ক্ষতের মত আমাদের শরীর ক্ষয় করছে। যথার্থ অপ্রতিকর হতে প্রাণে যে শান্তি আসে, আমরা তার একান্ত অনুভব করি। মনে হয় প্রতিকার করাই ভালো দিক, তোমার যদি অর্থের বাসনা থাকে এবং যদি তুমি জান যে সমগ্র জগৎ ধনলিপ্সু পুরুষকে অসৎ লোক বলে মনে করে তবে তুমি হয়ত অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করতে সাহসী হবে না, কিন্তু তোমার মন দিনরাত অর্থের দিকে দৌড়াতে থাকবে এরুপভাব কপটতা মাত্র, এর দ্বারা কোনো কার্য সিদ্ধি হয় না।

প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজ নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করতে চেষ্টা করা। কোন সমাএর সকল নরনারি একই মনস্ক, একই ক্ষমতা ও একই চিন্তার অধিকারী নয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ এবং আমাদের সেই আদর্শের সমালোচনা করার কোনো অধিকার নেই। সমাজে এটাই প্ররোক্ষ যে প্রতিটি মানুষ তাদের উচ্চচিন্তাতে আদেশের দ্বারা পরিচালিত

হবে এবং সেটাই হবে আদর্শ কেউ কারোর না বিচার করতে পারে না। যেমন ওক গাছের থেকে কোনো আপেল গাছ উন্নত এটা সঠিক বিচার হতে পারে না। এক্ষেত্রে সঠিক বিচার হল আপেলের দিক থেকে আপেল গাছ ভালো ওকের দিক থেকে ওক গাছ ভালো।

কর্মের নিয়ম হল কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করা কর্মের নিয়ম এটা বিবৃত করে যে, প্রত্যেকটা - কর্মের একটি সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে। সহজ কথায় বলতে গেলে যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন যা তুমি বপন করবে তারই তুমি কল পাবে। নিউটনের তৃতীয় নাতিসূত্রে একই কথা বলা হয়েছে প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত ক্রিয়া আছে। কর্মের নিয়মেও এটা বলা আছে প্রতিটি ক্রিয়াও প্রতিক্রিয়া এই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই নিয়মকেই কর্ম বলা হয়।

কর্মের নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট অবস্থার একহনের সঠিক প্রতিক্রিয়াকে পচ্ছন্দ করার জন্য তার স্বাধীনতা থাকা উচিত । যদিও আইনের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণভাবে এই প্রতিক্রিয়াগুলি চলে আসে। এইভাবে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণ সীমানার বাইরে চলে যায় এবং আমদের সেই পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। আমাদের কোনো স্বাধীনতা থাকে না ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যবহারের ওপর। কোন এক সময় আমরা আমাদের পছন্দকরলেও পরিস্থিতির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কর্মের নিয়ম অণুযায়ী পরিস্থিতি উৎপন্ন হয়।

আমরা আমাদের পচ্ছন্দ মত বীজ বপন করতে পারি, কিন্তু ফসল তোলার সময় যে ফল পাব আমাদের তাকেই গ্রহণ করতে হবে। আমরা একরকম বীজ বপন করে অন্যরকম ফল আশা করতে পারিনা। এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা কর্মের নিয়মই নিয়ন্ত্রণ করে। যদি আমরা আকটি আমের বীজ বপন করি তাহলে অবশ্যই ফল হিসাবে আমই পাব। আমরা নিম বীজ বপন করলে নিম ফলই পাব। এটা বোকামো হবে যে নিম বীজ বপন করে আম ফল আশা করব। তুমি যেমন বীজ বপন করবে তেমনটি ফসল পাবে। আমরা আমাদের অতীত জীবনে যেরকম কর্ম করেছি বর্তমানে তেমনই ফল পাচ্ছি।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের একটি দশতলা বাড়ী থেকে ঝাঁপো দেওয়ার পছন্দমতো স্বাধীনতা আছে। যাইহোক আমরা ঝাঁপ দিলাম, আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কি ঘটতে পারে ? আমাদের পছন্দের প্রতিক্রিয়া পুরোটাই আমদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

টিপ্পনী

আমরা নিশ্চিত যে আমাদের এই প্রতিক্রিয়াটি অতিত কর্মেদর সঞ্চিত ফল।

ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার বিচ্ছিন্নকরণ কর্মনিয়মের ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ ঘটনা। কর্মনিয়মটি চেনের মত সারিবদ্ধ থাকে বর্তমান জীবনের কাজটি তার অতীত জীবনের কর্মের দ্বারা কর্মের নিয়ম অনুসারে আমরা একটি বিষ্ময়কর মৃত্যুর ঘটনা কল্পনা করতে পারি যেখানে দেখব যে এই বস্তুপত জগতের অগণিত জীবন্ত সত্ত্বা জড়িয়ে আছে।

টিপ্পনী

ভালো কর্মের শক্তি হল নৈতিক। যদিও এটা অসংযুক্তি তেরি করে, এটি খারাপ কর্মকরার ইচ্ছাটা নষ্ট করে এবং মনও চিত্তের শুদ্ধি ঘটায়। কিন্তু যদি কোনো কাজ ইচ্ছাকৃত আনন্দের জন্য করা হয় তাহলে কেবলমাত্র খুব আনন্দই পাওয়া যাবে যা মন ও চিত্তকে শুদ্ধি ঘটাতেপারবে না। সুতরাং সকল কর্মই করতে হবে ওকোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছাছাড়াই ইচ্ছাযুক্ত কর্ম সর্বদা কর্মযোগীকে বহিস্কার কচরে দেয় কিন্তু নফলের ইচ্ছা বিহীন কর্ম যোগীকে স্বাথহীন করে এবং সকল বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটায়। কর্মযোগীর নীতিবাক্য হল - ''আমি নই কিন্তু তুমি'' এবং তাঁর আত্মত্যাগের কোনো সংখ্যা থাকবে না। যে যদি ফলাকাঙ্কা ছাড়া কর্ম করে তাহলে যে স্বর্গে যাবে। এবং জগৎ থেকে অনেক কিছুর প্রাপ্তি লাভ ঘটবে। যদিও এর যুক্তি পূর্ণ ব্যাখ্যা হল অস্বার্থপরতা কর্মই হল একমাত্র জ্ঞান যোগ। মানুষেদর স্বাভাবিক ধর্ম হল সকলকে ভালোবাসা এবং ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সকলের জন্য ত্যাগ করা। কর্মযোগ সেই সকল ব্যক্তির জন্য খুবই প্রয়োজন যারা ধনসম্পত্তির বন্ধন কে সহ্য বলে মনে করে।

'নিজেকে ছাড়া অন্যকে দোষ দিও না' আমাদের এমন কোন অসুবিধার পর্যায় পড়তে হয় সেখানে বিজেকে যদি দোষী না ভাবি তাহলে নিজেদের মধ্যেই বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং এখান ধেকেই আমরা না বুঝে মানুষ কে উত্তেজিত করি। আমরা যদি খুব আবেগ যদি খুব আবেগ পূর্ণ হই এবং পাপ কর্ম থেকে বিরত রাখি তাহলে আমাদের আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যারা অন্যকে কাছ থেকে আঘাত হয়, সেক্ষেত্রে ও তারা গর্ব করে আতিরিক্ত পরিমাণে আবেগ ধর্মী বলে। কিন্তু একজন প্রকৃত পরিণত আত্মা কখনই কোন অপমানের ছায়া অসম্মানের ছায়া, হতাশার ছায়া আগাত প্রাপ্ত হয় না ল প্রকৃত ঘটনা হল এই যে যখনই তুমি আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছ তখই উচিত নিজেকে দোষী ভাবা। শহিদের কথা যদি আমরা বলি তাঁরা অসহষনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে তবুও তারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈশ্বরকে প্রশংসা করে। প্রাকৃতিক কোন শক্তি

ছায়াই তারা আঘাত প্রাপ্ত হয় না। যীশুখ্রীষ্ট বলতেন তাদেরকে ভয় পেও না যারা দেহকে শেষ করে দেয় - ভয় তাদেরকে করা যারা আত্মাকে নিঃস্ব করে। নিজে ছাড়া কোন ব্যাক্তির এমন শক্তি নেই যে তোমাকে কষ্ট দেয়।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, খারাপকে প্রতিরোধ করঅবশ্যই তার শত্রুকে ভালোবাসা উচিত। যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তাকেও ভালোবাস। তাদের ভালবাস যারা তোমাকে ঘৃণা করে এবং তাদের ঘৃণা করা যারা তোমাকে অবজ্ঞাপূর্ণভাবে ব্যবহার করে।

যদি কোনমানুষ ভগবানের পূজার দ্বারা পৃথিবী ধেকনে মুক্তি পায় তবে অবস্যই তার ভাবা উচিত হবে না যে এই পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা ভগবান পূজা করা ছাড়া ভালো কাজ করবে, তাদের এটাই ভাবা উচিত নয় তার স্ত্রী সন্তানের জন্য জগতে বসবাস করে। তাদের সেই সকল চব্যাক্তিনিয়ে চিন্তা করা উচিত যাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্ধান নেই প্রত্যেকেই নিজের জায়গায় মহান। নিম্নের গল্পটি এই ধারনাটিকে বিশ্লেষন করতে সাহায্য করবে।

কোনো দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যে সমাগত সকল সাধু সন্ন্যাসীকেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহন করে যে বড়, না যে গৃহে থেকে গৃহস্থের সকল কর্তব্য করে যায় সেই মহান ? অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্যা মীমাংসা করার চেষ্টা করলেন কেউ কেউ বললেন, 'সন্ন্যাসী বড়'। রাজা এই বাক্যের প্রমাণ চাইলেন। যখন তাঁরা প্রমাণ দিতে অক্ষম হলেন,তখন রাজা তাঁদের বিয়ে করে গৃহস্থ হবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে এসে বললেন 'স্বধর্মপরায়ন গৃহস্থই বড়'। রাজা তাঁদের কাছেও প্রমাণ চাইলেন। যখন তাঁরা প্রমান দিতে পারলেন না, তখন তাঁদেরকেও তিনি গৃহস্থ করে নিজেদর রাজ্যে বাস করালেন।

অবশেষে এক যুবা সন্ন্যাসী এলেন, রাজা তাঁকেও ঐ একই প্রশ্ন করতে সন্ন্যাসী বললেন "হে রাজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকই বড়। রাজা বললেন 'একথা প্রমাণ করুণ'। সন্ন্যাসী বললেন হ্যাঁ, আমি প্রমাণ করব, তবে আসুন, কিছুদিন আপনাকে আমার মতো থাকতে হবে, তবে যা বলেছি, তা আপনার কাছে প্রমাণ করতে পারব।' রাজা সম্মত হলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুগামী হয়ে রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করে আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহাসমারোহে ব্যাপার

টিপ্পনী

চলছিল। রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যান্য নানা প্রকার বাদ্যধ্বনী এবং ঘোষণাকারীদের চিৎকার শুনতে পেলেন। পথে লোকেরা সুসজ্জিত হয়ে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঢেঁড়া পেটা হচ্ছে। রাজা ও সন্ন্যাসী দাঁড়িবে দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা কি। ঘোষণাকারী চিৎকার করে বলছিল - 'এই দেশের রাজকণ্যা স্বয়ংবরা হবেন।'

টিপ্পনী

সিংহাসনে সমাসীনা রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করলেন এবং বাহকগণ তাঁকে সভামধ্যে বিভিন্ন স্থানে নীয়ে যেতে লাগলেন। রাজকন্যা কারোও দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এমন সময় এক যুবা সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর রূপের প্রভা দেখে মনে হল যেন স্বয়ং সুর্যদেব আকাশপথে ছেড়ে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সভার এককোণে দাঁড়ীয়ে দেখছেন কি হচ্ছে। রাজকন্যাসহ সেই সিংহাসন তাঁর নিকটবর্তি হল। রাজকন্যা সেই পরম রূপবান সন্ন্যাসিকে দেখামাত্র বাহকদের থামতে বলে সন্ন্যাসীর গলায় বরমাল্য অর্পন করলেন। যুবা সন্ন্যাসী মালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এও বলতে লাগলেন, 'এ কি নির্বুদ্ধিতা ! আমি সন্ন্যাসি ; আমার পক্ষে বিয়ের অর্থ কি ?' সেই দেশের রাজা মনে করলেন, লোকটি বোধহয় দরিদ্র, সেইজন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করতে সাহস করছেন না ; তাই তিনি বললেন 'আমার কন্যার সঙ্গে তুমি এখনই অর্ধেক রাজত্ব পাবে এবং আমার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য।" এই বলে সন্নভাসির গলায় আবার মালা পরিয়ে দিলেন। 'কি কহে কথা! আমি বিয়ে করতে চাই না, তবু একি ? বলে সন্ন্যাসী পুনরায় মালা ফেলে দিতে দ্রুতপদে সেই সভা থেকে প্রস্থান করলেন।

এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যা এতদূর অনুরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি বললেন, 'হয় আমি একে বিবাহ করব, নতুবা মরব'। রাজকন্যা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁকে অলুবর্তন করলেন। তারপরে আমাদের সেই অপর সন্ন্যাসী যিনি রাজাকে যেখানে এনেছিলেন - বললেন,'চলুন রাজা আমরা এই দুজনের অলুগমন করি। এই বলে তাঁরা অনেকটা দূরে দূরে থেকে তাঁদের পেছনে পেছনে চলতে থাকলেন। কে সন্ন্যাসী রাজকুমারী পাণিগ্রহনে অসম্মত হয়েছিলেন, তিনি চলতে চলতে এক বনে প্রবেশ করলেন, রাজকন্যা তাঁর অনুগমন করলেন, অপর দুইজনও তাঁদের পিছনে পিছনে চললেন যেহেতু যুবা সন্ন্যাসীর বনের সব পথই অজানা নয় তাই কিছুক্ষন পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন - বনের পথে কিন্তু রাজকন্যার তো সেই পথ অজানা। তাই তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। তখন রাজা প্রথম সন্ন্যাসী যারা এই দুজনকে অনুসরন করছিল তারা

তাঁকে আশ্বস্ত করল যে তাঁরা তাকে এই বনের বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দেবে। তখন তারা তিনজনেই সেই ঠান্ডার রাত্রীতে একটা গাছের নীচে আশ্রয় নিল। সেই গাছে এক পাখির বাসা ছিল। তাতে একটি ছোট পাখী, পক্ষিনী ও তাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক ছিল। ছোট পাখিটি নিচের দিকে চেয়ে গাছের তলায় তিনজনকে দেখল এবং পক্ষিনীকে বলল, দেখ, কি করা যায় ? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি এসেছে - শীতকাল, আর আমাদের কাছেও আগুন নেই। এই বলে যে উড়ে গেল, ঠোঁটে করে একখন্ড জলন্ত কাঠ এনে তা অতিথিদের সামনে ফেলে দিল। তারা সেই অগ্নিখন্ডে কাঠকুটো দিয়ে বেশ আগুন প্রস্তুত করলেন। কিন্তু পাখীটির তাতেও তৃপ্তি হল না।সে তাঁর পত্নীকে বলল "প্রিয়ে আমরা কি করি ? এরা ক্ষুধার্ত। তাই আমি ঠিক করেছি আমি আমার শরীরটাই দেব :" এই বলে সে উড়ে গিয়ে সেই অগ্নির মধ্যে পড়ল ত মারা গেল। পক্ষীনী এই দৃশ্য দেখে ভবল এরা তিনজন রয়েছে খাবার জন্য মাত্র একা পাখী। তাই স্বামীর কথা ভাবার আমারও প্রয়োজন রয়েছে তাই আমিও নিজেকে বিসর্জন দেব। এই বলে সও নিজেকে বিসর্জন দিল। শাবক তিনটি সবই দেখল। তরা দেখল এটাও পর্যাপ্ত কাবার নয় তাই তারাও অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিতে নিজেদের বিসর্জন দিল।

তখন সন্ন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, 'রাজন দেখলেন তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসার থাকতে চান তবে ঐ পাখিদের মত প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকুন। আর যদি সংসার ত্যাগ করতে চান, তবে ঐ যুবকের মতো হন, যার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতি ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হয়েছিল। যদি গৃহস্থ হতে চান,ম তবে আপনার জীবন সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বেছে নেন, তবে সৌন্দর্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়, কিন্তু একজনের যা কর্তব্য, তা অপরজনের কর্তব্য নয়।

১.৩.৩. কাজের গোপন রহস্য :

কর্মযোগের অনুশিলনের অর্থ এই নয় যে, একজনের প্রচুর পরিমাণ সম্পদ ধারণ করা প্রয়োজন। একজন তার মনও দেহকে সেবা করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একজনকে অন্যজনকে সাহায্য করা উচিত - এইভাবে হৃদয় বিশোধিত হয়।

টিপ্পনী

কর্ঞ্চযোগেদর আদর্শকে অর্জন করতে গেলে একজনের অহৎকে বিনষ্ঠ করতে হবে ।যোদি কারোর জানবার ইচ্ছা হয়, তাহলে তাকে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হতে হবে । একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাছে জ্ঞানের কোনো অর্থ নেই।

টিপ্পনী

একজন মানুষ যে প্রথমেই কর্মযোগে বীশ্বাস করবে এমন কোনো মানে নেই। ঠিক যেমনি অহং থেকে মুক্তি পাওবা খুবই কঠিন। একজনকে ঐ পর্যায়ে মন থেকে পৌছাতে গেলে মন থেকে খুবই শক্ত হতে হে। প্রত্যকেদর উচিত প্রার্থনার সময় ভগবানের কর্মশক্তি চাওয়া এবং বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী ও পুঁথি হতে শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

একজনের বেশি নিস্কর্মা যোগ (আত্মবিহীন সেবা) তে নজেকে নিয়োজিত করা উচিত নয়। জনসাধারণের সঠিকউদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনহিতকর কাজকর্ম নিজেকে নিয়োজিত করা একটি ভালো কাজের উদাহরণ ।সমস্ত কর্মেরমধ্যে আত্মশুদ্ধি ঘটানো খুবই দরকার। এরপর আমরা এটা বলতে পারি যে, প্রত্যেক ধরনের ক্রিয়া হল ভগবানের পই একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য তখনি যখন মুক্ত ও শুদ্ধ চিত্তএ এটিকে সম্পাদন করা হয়ষ।

কর্মযোগ হল একটি মহান সমতাসাধক যা বিভিন্ন অলীক অস্তিত্বহীন পার্থক্য দূর করতে সাহায্য করে। এটি ঐক্য ও সমতার অনুভূতিকে নিয়ে যায়। এটি অলসতা ও নিস্ক্রিয়তা দূর করতে সাআয্য করে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত কর্মযোগের অনুশিলনের প্রতি মনোযোগী হওয়া - এটি হল নিঃস্বার্থ কর্ম। এটি মানুষকে স্বর্গীয়ভাবে উন্নয়নসাধনের কাছে সাহায্য করে এবং এটি মন থেকে সমস্ত ধরনের অপচিত্রতাকে দূর করে। এটি মানুষকে একতি নির্দিষ্ট দিক খুঁজতে সাহায্য করে। এটি প্রত্যেক মানুষের মনে পবিত্র রশ্মি, ঐশহবরিক করুণা এবং পবিত্র জ্ঞানকে অর্ভ্যথনা জানায়।

এটি হৃদয়কে প্রসারিত কচরে - সমস্ত বাধাভেদ করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে শেখাব এবং স্বতঃলব্ধ জ্ঞান প্রদান করতে সাহায্য করে। এটি মানুষকে স্বর্গীয় গুণ প্রদান করে এটি হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংবোধ, মানসিকতাকে বিনষ্ট করে। এটি একটি যোগ যা নিঃস্বার্থ কর্ম করলে তার ফল সম্পর্কে কোনো চিন্তা করতে হয় না। এই কাজটি হল পূজা প্রার্থনা যা ঈশ্বরকে নিবেদন করা হয়। কর্ম যোগের অনুশীলনের মধ্যে অবর্ননীয় আনন্দ সর্বদাই বিদ্যমান।

একজন কর্মযোগীকে সর্বদাই লোভ, কামনা, রাগ, আত্মঅহংবোধ হতে মুক্ত থাকা উচিত। এইসমস্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই মানবকল্যান করা সম্ভব। একজন কর্মযোগীর সর্বদই বিনম্র, ভলোবাসাপূর্ণ প্রকৃতি, সঠিক অভিযোজন, সহ্যক্ষমতা, দয়া, জাগতিক ভালোবাসা, থাকে উচিত। তাহলেই তিনি অন্যদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মানিয়ে চলতে পারবেন।

টিপ্পনী

একজন কর্মযোগীর সবাইকে ভালোবাসার মহান হৃদয় থাকা দরকার। তিনি সমর্দশ্যতা থাকা ইচিত। তাঁর অবশ্যইঠান্ডা ও সুষম মস্তিষ্ক থাকা দরকার। তাঁর অণ্যের আনন্দে আনন্দিত হওবা উচিত। তাঁর ইন্দ্রিয়ের সংযম থাকা আবশ্যক। তাঁর সহজ সরল জীবন অতিবাহিত করা প্রয়োজন। যে মানুষটি সহজেই অন্যের অপমান, অসম্মান, ভৎসর্না, কলঙ্ক, অমর্যাদা, কুকথা, উত্তাপ, এবং রোগের ব্যাথা সহ্য করতে পারবে সেই প্রকৃত কর্মযোগী। তার সহ্যক্ষমতা হতে হবে প্রবল। তাঁর নিজের প্রতি, ভগববানের প্রতি এবং গুরুবাক্যের প্রতি বিশ্বাস থাকা উচিত। এইধরনের মানুষই হল প্রকৃত কর্মযোগী যিনি নিজের উদ্দেশ্যে খুব তাড়াতাড়ি সফল হতে পারবেন। যে মানুষটি পৃথিবীকে সেবা করতে চায় সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে সেবা করে।

একজনের সর্বাদই উচিত নিজের মধ্যে নম্রতা, দয়া, সহ্যক্ষমতা , অনকম্পা এইগুলির বৃদ্ধি করা। পৃথকতার উপলব্ধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবং তার চরিত্রে স্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হওয়া দরকার এটি জীবনের গভীরতাকে বুঝতে সাআয্য করে এবং ঐক্যতা ও সমতার তাৎপর্য বহন করে।

যদি কেউ আধাত্মিক পথে বিকশিত হতে চায় তাহলনে তাকে রোহকালীন সমস্চত কাজ করতে হবে - তার জীবনের অণ্তিম সময় পর্যন্ত। একজনের কাছ ধেকে বিরত হওবা উচিত নয় যদি যে একজন কর্মযোগী হিসাবে উন্নীত হতে চায়। এটি সর্বদা সমভাবে উল্লেখযোগ্য হল বিশ্লেষণ করতে হবে তোমার নিজেদর কর্মকে। কর্ম যদি পবিত্র হয় তা্লেই তোমার আধ্মতিকতার পথে উন্নতিসাধিত হববে।

ভগবান কৃষ্ণ আশাবাদী ছিলেন যে আমরা সর্বদা গতিশীল শান্তির পথে ণঅউশিলন করব। তিনি কয়েক সেকেন্ড সময়ের জন্যেও আমাদের কাছ থেকে অলসতা আশা করতেন না, যে কাজ করতেন সেই ছিল তার পরিয় পাত্র। এই কর্মগুলি জন্য অনুশিলন, দান, দাপস ও তভাগ এই নামে পরিচিত ছিল। মানুষের আত্মসংযম

টিপ্পনী

অণুশীলন করা উচিত। মানুষের উচিত "দয়াদাক্ষিণ্য"তে অনুশীলন করা - তার দেওয়া দেওয়া দেওয়াই উচিত। তার নিজেদর কাছে যা আছে তা দিয়ে দেওয়া উচিত। তার দৈনন্দিন কাজকর্মকে পরিবর্তিত করে প্রতি নিয়ত স্বার্থতভাগ মানসিকতাকে গ্রহণ করতে হবে। তার উচিত এটা অনুভব করা যে সে ব্রাহ্মণ যে বিভিন্ন কাজকর্মতে নিয়োজিত করে। অসংযুক্তভাবে তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকে সম্পাদন করা উচিত।

তোমার কর্ম তুমি কর কিন্তু ভেতর থেকে তুমি অনুভব কর যে এই পৃথিবীতে তুমি একটি যন্ত্র থাকে ভগবান চালিত করেছেন। অণুভব কর তুমি একটি প্রকৃত সত্ত্বা। সেই কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগকে বর্ণনা করেছেন কর্মদক্ষতা। কর্মযোগ হল নিজেই একটি শিল্প। কর্মযোগের গোপনীয়তা হল এটি গভীর ও সঠিক বিশ্লিষ্টকরণের সংমীশ্রণ। যদি কাজটা কাজের মতোন করা হয়, তাহলে এই ধরনের কাজ জনগণের জন্যেই মতোন করা হয়, এবং তাতে অণাবিল শান্তি পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাব একধরনের আশীর্বাদ যা সমস্ত বোঝাপড়া বর্ণনীয় উর্দ্ধে। আর এভাবেই ভগবানে স্বর্গদ্বার তোমার জন্য খুলে যায়। এটাই ভগবতগীতাতে বলা আছে। স্বার্থহিনতা কর্ম কখনোই সত্ত্বাবিহীন কর্মণয়।

সংসারের জীবনচক্রে অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর পর্যায় ক্রমিকতায় যাই করাহোক না কেন এই অনুভূতিই বন্ধ করে। কর্মযোগ অভ্যস্থ করার জন্য তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। তোমাকে অহং হতে মুক্ত হতে হবে। তোমেকে কৃতজ্ঞতাবোধ হতে দূর ধাকতেই হবে। তোমাকে উন্নতি ও ব্যর্থতার মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে।

নিজের কর্মের প্রতি সঠিক মননিবেশই একজনকে পরিপূর্ণতা ঘটায়। যদি একজন ব্যাক্তি তার কর্মের প্রতি নিয়োজিত হয় তাহলেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। অনুভূতি ও ধারনার প্রতি অণুগত হয়ে তার চেতনার উন্নতি ঘটায়। আমরা আমাদের উচ্চতর পর্যায় আত্মউন্মুক্ততা প্রকাশ করতে পারি। এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় নিজের স্বভাব দ্বারা এবং নিজের কর্মের দ্বারা পরিপূর্ণতা অধিকার করা সম্ভব।

ক্ষুদার্থকে খাদ্যদান, অসুস্থকে সুস্থ করা, একজনমানুষকে শিক্ষিত করা যাতে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এগুলি সবই ভালো ও মূল্যবান সেবার আকার। আধ্যাত্মিক সেবাই মাউষ কে নতুন আলোকে আলোকিত করে যার ফলে সে দৃঢ় হবে ওঠে এবং তার মধ্য দিয়ে সমস্ত অভাব দূরীভূত হয় এটাই হল সেবার সর্ব্বোচ্চ উচ্চ

আকার।

সমস্ত কর্মই হল ভালো ও খারাপ ফলের সংমিশ্রণ।কর্মের ফল অণুযাবী ভালো খারাপ ফল পরিলক্ষিত হয়।

ভগবতগীতাতে কর্মলোপ বর্ণিত হয়েছে কর্মের পথ হিসাবে যেখানে ফলের চিন্তা না করেই ১০০% চেষ্টাকরার কথা বলা হয়েচে। কর্মযোগ সবকিছুতেই প্রযোজ্য সবচেয়ে তুচ্ছ, সাধারণ থেকে বড় এবং বড় বড় প্রতিযোগিতাপূর্ণ কাজে। কর্ম করতে হবে স্বার্থহীনভাবে নিজের সম্পূর্ণ লক্ষ্য ও মনোযোগ সহকারে। এটিই তৃপ্তি ও স্বাধীনতা ডেকে আনে। ফলের চিন্তা না করে কর্ম করলে নিজের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হবে যা হল কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্যেক কাজ ভালোমন্দের সংমিশ্রণ। সুতরাং অবিরত কর্মের দ্বারা প্রত্যেকেই নির্দেশিত হয়।

টিপ্পনী

এটাই হল কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থহীন ভাবে নিয়োজিত করা এবং এইভাবে সর্য়দা আত্মতুষ্টি পাওয়া যায় । কোনোরকম চিন্তাভাবনা ও আত্মপাওনা ছাড়াই। কর্মযোগ ভক্তি যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভালোবাসা ও ভক্তি ছাড়া আত্মত্যাগ করে অন্যের সেবা করা অসম্ভব। একজনের প্রতি কর্তব্য ও মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা - নিজের কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই যা হৃদয়কে পরিশ্রুত করে এবং মনের মধ্যে আত্মতুষ্টি আনে। ভগবতগীতাতে বলা হয়েছে যদি আমরা মন দিয়ে কাজ না করি তাহলে এটা আমাদের আত্মার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতা পারে না। আমাদের অবশ্যই বুঝতে চেষ্টা করা উচিত অসংযুক্ত তার অর্থ কি।

সমস্ত কর্মই মনের ওপর ছাপ ফেলে যায় যাই চরিত্র নামে পরিচিত। যখন একটি মানুষ বারবার এবং একইভাবে ভালো কর্ম করে এবং খারাপকে এড়িয়ে চলে তাহলে ভলো ফল পেতে সে বাধ্য। তার চরিত্র ভালোরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সে নিজের ইন্দ্রিয় সংযমের বৃদ্ধি ঘটাবে এবং ভুল দিক থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।

কাজের উচ্চতম পর্যায় হল এমন যেকানে কোনো বন্ধন থাকবে না। এটাই হল কর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। ভগবত গীতার শিক্ষা অনুসারে এটাই হল অপসৃত কাজ। ঔঅপসৃত করার জন্য দুটি শর্তের প্রয়োজন।

আমাদের এই ধারনার বিশ্বাস করতে হয় যে এই পৃথিবী আমাদের আসল

টিপ্পনী

বাসস্থান নয়, এটি শুধুমাত্র একটা পর্যায় যেটা আমরা অতিক্রম করছি। মানুষ তার অবজ্ঞায় ভাবে যে প্রকৃতির জন্যেই আত্মা কিন্তু সত্যকথা হল যে, আত্মার জন্যেই প্রকৃতি - এই শিক্ষাই হল সর্ব্বোচ্চ মুক্তি। যখন আমরা প্রকৃতিও তার গুণের একটা অংশ মনে করি তখন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রাপ্ত প্রতিদৃষ্টিতে আবাদ হই। আমরা নিজেই নিজেতে পরিণত হই।

স্বাধীনতা শুধুমাত্র ভালোবাসার দ্বারাই সম্ভব। স্বাধীন কর্ম ক্রীতদাসের কর্ম নয়। ক্রীতদাসের কর্ম হল স্বার্থপরতা ও আসক্তিপূর্ণ। এটি সত্য ভালোবাসার উপর নির্ভরশীল নয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হে অর্জুন আমাকেই দেখল, আমি যদি এক মুহূর্ত কর্ম থেকে বিরত থাকি,সমগ্র জগৎ ধ্বংস হবে,কর্ম করে আমার কোন লাভ নেই। আমি জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন? - জগৎ কে ভালবাসি বলে। ঈশ্বর ভালোবাসেন বলে তিনি অণাশক্ত। প্রকৃত আলোবাসা আমাদের কে অনাসক্ত করে। যেখানে দেখবে অনাসক্ত পার্থিব বস্তুর প্রতি এই আকর্ষন, সেখানেই জানবে প্রকৃত আকর্ষন, কতকগুলি জড়বিন্দুর সাথে আর কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকর্সন মাত্র - কিছূ যেন দুতি বস্তুতে ক্রমাগত নিকটে আকর্ষন করছে, আর ওটা পরস্পর, খুব নিকটবর্তী হতে না পারলেই যন্ত্রনার উদ্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা ভৌতিক বা শারীরিক আকর্ষনের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। এরূপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হতে সহস্র মাইল ব্যবধান থাকতে পারে। কিন্তু তাতে তাঁদের ভালোবাসা অটুট থাকবে। বিনষ্ট হবে না এবং এই হতে কখনো কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হবে না।

অর্জুন উবাচ :

জ্যায়সী চেৎ কর্মপস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎকিং কর্নি ঘোরে সাং নিয়োজয়সি কেশব।। (৩.১)

অর্থ : অর্জুন বলেছেন - হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করেছেন?

ব্যাসিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীর যে।
এদেকং বদ নিশ্চিত্যে যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্।। (৩.২)

অর্থ : উভয়ার্থবোধক মিশ্রিত সদৃশ বাক্য দ্বারা আপনি আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করেছেন, অতএব একটি পথ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমি শ্রেয়োলাভ করতে পারি।

শ্রীভগবানুবাচ :

লোকেহস্মিন্ দ্বির্থিবা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তাময়ানখ

জহমানযোগেন সাংখ্যানাং কর্নযৌগেন যোগিনাম্।। (৩.৩)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন - হে নিষ্পাপ অর্জুন ইহলোক দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে তা পূর্বেই বলেছিল সংখ্যাযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দআবরা এবং যোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা হয়ে থাকে।

ন কর্মনামানারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহ শ্নুতে।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।। (৩.৪)

অর্থ : কর্মারম্ভ না করলে মানুষের নৈষ্কর্ণ্য অর্থাৎ যোগনিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না এবং কর্ম ত্যাগ করলেই সাংক্যনিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না।

ন হি কশহচিৎ ক্ষনমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ

কার্যতে হ্যবশ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতি জৈর্গুনৈ।। (৩.৫)

অর্থ : কেউই এক মুহূর্ত ও কর্ম নাকরে থাকতে পারে না কারণ সকল মানুষই প্রকৃতিজাত গুণ সমূহের প্রভাবে অবশ হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়।

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংখ্যা আস্তে মনসা স্মরণ

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্চতে।।

অর্থ : যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যাক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ে চিন্তাকরে তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়।

আমরা অনেক সময় ন্যায় ধর্ম ও নিজনিজ অধিকারের কথা বলি। দুটি ভাবে মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রন হয়ে থাকে ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতা প্রয়োগ চিরকাল স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু দয়া স্বর্গীয় বস্তু।

আর এক উপায় আছে, যার দ্বারা এই দয়া ও নিঃস্বার্থপরতা কার্যে পরিণত করা যেতে পারে, যদি আমরা সগুণ ব্যাক্তিভাবাপন্ন উশ্বরে বিশ্বাস করি তবে কর্মকে উপাসনা

টিপ্পনী

বলে চিন্তা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমুদয় কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে থাকি। এইরূপে তাঁকে উপাসনা করলে আমাদের কর্মের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করার অধিকার আমাদের নেই। জল যেমন পদ্মপত্র ভেজাতে পারে না ফলে আসক্তি উৎপন্ন করে কর্ম তেমনি নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে করতে পারে না। অহংশূণ্য ও সনাক্ত ব্যক্তি জন পূর্ণ পাপ সঙ্কুল শ্রের অভ্যন্তরে বাস করতে পারেন তাতে তিনি পাপে লিপ্ত হবেন না।

টিপ্পনী

মহাভারতে এক অস্বার্থপরতা কর্মের বর্ণনা দেওয়া আছে :

নকুল সম্বন্ধীয় গল্প : এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র ও পুত্র বধুসহ বাস করতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরীব ছিল।শাস্ত্রপ্রচার ও ধর্মাপদেশ দ্বারা লব্ধ ভিক্ষাই ছিল তাঁর জীবিকে। সেই দেশে একদা পরপর তনবছর দুর্ভিক্ষ হল তখন গরিব ব্রাহ্মনটি আজও কষ্ট পেতে লাগলেন। অবশেষে সেই পরিবারকে পাঁচদিন উপবাসে ধাকতে হল। সৌভাগ্যক্রমে ষষ্ঠ দিনে পিতা কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করে আনিল এবং তার চারভাগ করলেন। তারা ওটা খাদ্যরূপে প্রস্তুত করে ভোজনে বসেছেন এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। পিতা দ্বার খুলে দেখলেন যে এক অতিথি দাঁড়িয়ে। ভারতবর্ষে অতিথি বড় পবিত্র ও মাননীয়। সেই সময়ের জন্য তাকে নারায়ণ মনে করা হয় এবং তার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হয়।

সুতরাং দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বলিলেন আসুন মহাশয় আসুন বলে ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মুখে নিজের ভাগের খাদ্য রাখলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই শেষ করে বললেন 'মহাশয়' আপনি আমকে একেবারে মেরে ফেললেন দেখছি। আমি দশদিন ধরে উপবাস করছি এই অল্পপরিমান খাদ্যে আমারা জঠরাগ্নি আরও জ্বলে উঠল। তখন ব্রাহ্মণী স্বামীকে বললেন আমার ভাগটাও ওনাকে দিন। স্বামী বলিল না তা হ না কিন্তু ব্রাহ্মণ পত্নী জোর করে বললেন যে এ দরিদ্র অতিথি আমাদের নিকট উপস্থিত আমরা গৃহস্থ আমাদের কর্তব্য তাঁকে খাওয়ানো।আপনার যখন আর কিছু দেওয়ার নেই সহধর্মিনী রুপে আমার কর্তব্য তাঁকে আমার ভাগ দেওয়া।" এই বলে তিনিও নিজের ভা অতিথি কে দিলেন। অতিথি তখনই তা শেষ করে ফেললেন এবং বলিলেন আমি এখন ক্ষুদাব জ্বালায়। তখন পুত্র বলল আপনি আমার ভাগটাও গ্রহন করুন। পুত্রের কর্তব্য পিতাকে তাঁর কর্তব্য

পালনে সাহায্য করা। অতিথি তাঁর ভাগটাও শেষ করে ফেললেন কিন্তু তাতেও তৃপ্ত হইল না তখন পুত্রবধূও তার ভাগ দিলেন। এই বার তাঁহার আহার পর্যাপ্ত হল। অতিধি তখন তাদের আশির্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

নকুল পান্ডবদের বললেন - ঐ ছাতুর গুঁড়া কিছু মেঝেয় পড়েছিল। যখন আমি তার উপর গড়াগড়ি দিলাম তখন আমার শরীর অর্ধেক সোনালী হয়ে গেল। আপনরা সকলে তো দেখলেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার ইচ্ছা যে এইরূপ আর একটি যোগ্য দেখব। কিন্তু সেইরূপ যোগ্য দেখতে পেলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অর্ধেক সুবর্ণেপরিণত হল না। সেই জনভ আমি বলছি এটা যজ্ঞই নয়।

ভারতবর্ষে অতিথিদের নারায়ন ভাবা হয় কারণ তার মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান। অতিথি এলে কোন অভিযোগ ছাড়াই তাকে খাদ্যপ্রদান করা হয়ে থাকে। যদি অতিথি সেই ক্ষুদ্র খাবারে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে পরিবারের সকলের খাবার থেকে ভাগ করে দেওয়া হয়ে থাকে। অতিথি সন্তুষ্ট হওয়ার পর সেই পরিবারকে আশির্বাদ করা যায়। গরীব ব্রাহ্মণ যে জলে পা ধুয়েছিল সেই জলে নকুলের লেজ স্পর্শ করতেই সোনা হয়ে গেল কিন্তু সেই জল উড়ে গেল নকুলের পুরোদেহ সোনা হল না।

তারপর থেকে যথার্থ যজ্ঞের খোজে যুদ্ধিষ্ঠির এখানে পৌছাল। কিন্তু যুধিষ্ঠির এই জলে গড়াগড়ি খেয়েও কিছু হল না।

নকুল সকলকে স্মরণ করেছিল যে দান প্রচুর পরিমাণে অর্থের মধ্যে দিয়ে নয় এটা নির্ভর করে হৃদয়ের সার্বিক ভালবাসার মধ্য দিয়ে।

কুরক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসানে পঞ্চপান্ডব এক মহাযজ্ঞ করে দরিদ্রদের নানাবিধ বহুমূল্য বস্তুদান করলেন। সকলেই এই যজ্ঞের জাকজমক ও ঐশ্বর্য চমকৃত হয়ে বলতে লাগল জগতে পূর্বে এরুপ যজ্ঞ আর হয়নি। যজ্ঞ শেষে এক ক্ষুদ্রকায় নকুল এসে উপস্থিত হল। তার অর্ধশরীর সোনার মত রং বাকি অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে বলল, 'তোমরা সব মিথ্যাবাদী এটা যজ্ঞই নয়। তারা বলল কি তুমি বলছ এটা যজ্ঞ নয়? তুমি কি জাননা এই যজ্ঞা দরিদ্র কে কত ধনরত্ন প্রদত্ত্ সকলেই ধনবা ও সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এর মত অদ্ভুত যজ্ঞ আর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কেউ কখন করেনি। নকুল বলল সবই মিথ্যা এখানে কোন আত্মত্যাগ নেই। আত্মতভাগ দল এক ক্ষুদ্র ব্রাহ্মনের অতিথিকে খাদ্য দানের মধ্যে। এক ক্ষুদ্র বরাহ্মণ পাঁচদিন অনাহার থাকার পর সৌভাগ্য বশত চারটুকরো খাদ্যসংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বড়িতে ক্ষুদ্ধার্ত অতিথি আগমনের ফলে সেই খাদ্য ব্রাহ্মন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধু একে একে সকলেই নিঃস্বার্থ মনে অতিথিকে প্রদান করে আতিনিষ্ঠ কাজ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন। সেই রাতে ঐ চারটি লোক অনাহারে মারা গেলেন।

নকুল পান্ডব কে বলল কিন্তু কিছু ছাতুর গুঁড়ো মেঝেয় পড়েছিল। যখন আমি তার উপর গড়াগড়ি দিলাম তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হয়ে গেল। যেমন আপনারা খছেন। তখন থেকে আমি সারা পৃথিবী ব্যাপি এই আশায় ক্ষুরাদি যে এই রকম আত্মত্যাগ আর আছে কিনা ? কিন্তু আমি কোথাও সেটা দেখতেপাইনি। সেই কারণে আমার দেহের অর্ধেক অংশ আর সোনালী হতে পরেনি। এই কারণে আমি বলছি যে এটা আত্মত্যাগ নয়।কর্মযোগের অর্থ হল কোন ফল ছাড়াই মৃত্যু পর্যন্ত অন্যদের সাহায্য করা। দরিদ্রকে দান করা কৃতজ্ঞতা ছাড়া কোন আত্ম অহংকার কোর না। বরং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হস্ত কেননা তারা তোমাকে দানের সুযোগ করে দিয়েছে। সুতরাং এটাই সাধারণ যে একজন আদর্শ সংসারী মানুষ হওয়া একজন আদর্শ সন্ন্যাসীর থেকেও কঠিন কাজ। জীবনে সত্যকর্ম হল আত্মত্যগের সমান। এমন কি কোন মানুষ এই যে আমার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। এবং তাঁর আত্মত্যাগ অতীতের ঘটনার সঙ্গে মিলবে।

১.৩.৪. কর্তব্যের ধারনা :

যখন কর্মযোগ আমরা পড়তে আরম্ভ করি তখন কর্তব্য সম্পর্কে ধারনাটিই খুব প্রয়োজন। যদিও এই ধারনাটি ভীষন কঠিন কেননা এর সার্বিক কোনো নিম নেই। এটা এক একটি সম্প্রদায়ের ও দেশের মধ্যে পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

সর্বত্রই কর্তব্যের এই সাধারণ ধারনা দেখা যায় যে প্রত্যেক সৎ ব্যাক্তিই নিজ বিবেকের আদেশ অণুযায়ী কর্ম করে থাকেন। কিন্তু বিশেষ কোন গুণ কর্মকে পরিণত করে ? যদি একজন খ্রীষ্টান সম্মুখে গোমাংস পেয়ে নিজের প্রানরক্ষার জন্য আহার না করে অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য তাকে না দেয় তাহলে সে নিশ্চয়ে বোধ করবে যে, তারা কর্তব্যে অবহেলা হয়েছে। কিন্ধতু একজন হিন্দু যদি ঐ রূপ ক্ষেত্রে ওটি ভোজন

করতে সাহস করে অথবা অপর হিন্দুকে তার কর্তব্য পালন করা হল না। হিন্দুরা শিক্ষা ও সংস্কার তার হৃদয়ে ঐরূপ ভাব এনে দেবে। গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামা কুখ্যাত দস্যুদল ছিল। তাদের ধারনা ছিল যাকে পাবে তাকে মেরে সর্বস্বঅপহরণ করাই তার কর্তব্য; আর যে যত এশী লোক মারতে পারত সে নিজেকে তত বড় মনে করত। সাধারণতঃ একজন পথে বার হয়ে আর একজনকে গুলি করে হত্যা করলে অন্যায় কাজ করেছে মনে করে কষ্ট পায়। কিন্তু সেই ব্যাক্তিই যদি সৈণ্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শুধু একজন কে নয়, বিশজনকে গুলি করে হত্যা করে তবে সে আনন্দিত হবে এই ভেবে যে সে অতি সুন্দর ভাবে তার কর্তব্যপালন করেছে। অতএব এটি সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কি করা হয়েছে তা বিচার করেই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না সুতরাং ব্যাক্তি নিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এটি কর্তব্য এটি অকর্তব্য - এরুপ নির্দেশ করে কিছু বলা যায় না। তবে ব্যাক্তি বা আধ্যাত্মের দিক থেকে কর্তব্যেদর লকষ্যন নির্ণয় করা যেতে পারে। যেকোন কার্য ভগবানের দিকে নিয়ে যায় তাই সৎ কার্য এবং যে কার্য আমাদের নিম্নদিকে নিয়ে যাব তাই ওঅসৎ কার্য। আধ্যাত্মভাবের দিক থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই কতকগুলি কার্য আমাদের উন্নত ও মহান করে আবার কতক গুলি কার্যের প্রভাবে আমরা অবণত ও পশুভাবাপন্ন হয় পড়ি। কিন্তু সর্ধাবস্থায় সর্বাধিক বভাক্তির পক্ষে কোন কার্যের ছায়া কিরূপভাব আসবে তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়।

ভগবত গীতা জন্ম ও অবস্থা (বর্ণাশ্রম) গত কর্তব্যের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। বিভন্ন কর্মের প্রতি কোন ব্যাক্তির মনোভাব কিরূপ হবে তা ঐ ব্যাক্তির বর্ণ,আশ্রয়, ও সামাজিক মর্যাসা অনুসারেই অনেকতা নিরূপপিত হয়। এই জন্য আমাদের কর্তব্য যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা অনুসারে প্রথম কাজ করা যাহা ছায়া আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষতভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে সকল সমাজে ও সকল দেশে এক প্রকার আদর্শ ও কার্যপ্রণালী প্রচলিত নয়। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির প্রতি আমরা জাতির ঘৃণার প্রধান কারণ।

তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে যে কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই কম কর্ম কে প্রধান করতে হবে। সুতরা নিম্ন মানের কর্ম হলেও কর্মের জন্যই কর্ম করা উচিত আমরা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দেখব যে দর্শনে কর্তব্য - নীতিকথা - ভালোবাসা বা কোন যোগের মধ্যে হোক না কেন উদ্দেশ্য হল নিচু সত্তা কে দুর্বল করে উচ্চ সত্তা কে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ লক্ষ্য হল নিচু সত্তা কে দুর্বল করে আত্মাকে উচ্চস্থানের পৌছে দেওয়া। এটি সম্পাদিত হয় নিচু ইচ্ছাকে প্রতিনিয়ত অস্বীকারে ছায়া। এইভাবে সমগ্র সমাজের প্রতিষ্ঠান গুলি গড়ে উঠেছে। সচেতন ও অসচেতনতার দ্বারা কর্ম এবং অভিজ্ঞতার জগতে যেখানে যে পথ সীমাহীন সম্প্রসারনতা কে নির্দেশ করে মানুষের প্রকৃত চরিত্রে উন্নতি ঘটায়।

সাধারণত একজন পথে বার হয়ে অণ্য একজনকে গুলি করে হত্যা করলে অন্যায় করেছে মনে করে দুঃখিত হয়। কিন্তু সেই ব্যাক্ত যি সৈণ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শুধু একজনকে নয় বিশ জনকে হত্যা করে তবচে সে আনন্দিত হয় এইভাবে যে, সে অতিসুন্দর ভাবে তার কর্তব্য সম্পন্ন করেছে, অতএব এটুই বেশ সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে কি করা হয়েছে বিচার করে কর্তব্য নির্ধারিত হয় না। সুতরাং ব্যাক্তি নিরপেক্ষ কর্তব্যের সংজ্ঞা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে ব্যাক্তি বা আধ্যাত্মের দিক ধেকে কর্তব্যের লক্ষণ নির্ণয় করা যেতে পারে। যে করি ভগবানের দিকে নিয়ে যায় তাই সৎকার্য আর যে কটি আমাদের নিম্ন দিকে নিয়ে যায় তা অসৎ কার্য। আর এই অসৎ কার্য আমাদের কর্তব্য নয়।

কদাচিৎ কর্তব্য তৃপ্তিদায়ক হয়। এটা কেবলমত্র ভালোবাসার ফল। চাকায় তেল দিলে যেমন সহজে চলে তেমনি ভালবাসা একাই স্বাধীনতাকে উজ্জ্বল কর। আর স্বাধীনতার উচ্চ আবেগকে গ্রহণ করতে হলে ধৈর্যশীল হতে হবে। সংসারি জীবনের কর্তব্যে পরিপূর্ণতা পেতে হলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী কারন সম্পর্ক গুলি ভালোবাসায় নয় স্বাধীনতার উপর স্থাপ্তিত যা স্বার্থপরতা আচ্ছাদনে আবৃত।

সকল যুগের, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের মানুষ কর্তব্য সম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে এবং ওটা এই সংস্কৃত শ্লোকার্থে বর্ণিত হয়েছে - পরোপকারঃ পুন্যায় পাপায় পর পীড়নয়্।

ভগবৎগীতাতে উল্লেখিত আছে যে মানুষের জীবনের কর্তব্যগুলি মানুষের জীবনের জন্ম ও স্থান অনুযায়ী নির্ভর করে। ব্যাক্তিজীবনের প্রতিটি কর্মই মানসিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। সুতরাং সেই সমস্ত কর্ম পালন করাই প্রয়োজন? যা আমাদের আদর্শকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। কিন্তু এই আদর্শ গুলি অন্য সমাজে

গ্রহনযোগ্য নাও হতে পারে।

নারি ও পুরুষের জীবন নৈতিকতাই হল প্রথম মহৎ গুণ। যদি কেহ ভুল পথে চালিত হয় তখন সে প্রকৃত স্ত্রীর গুণেদর দ্বারা যে একটি সার্থক পথে চালিত হবে তা খুবই বিরোল। একজন গুণী স্ত্রী প্রতিটি ব্যাক্তিকে সেই রূপেই দেখ যেমন তার শিশুকে দেখে কারণ তার মধ্যে মাতৃত্ব বোধেদর আচরণ লক্ষ্য করা যায়। সেই রূপে প্রতিটি পুরুষদেরও নিজের স্ত্রী ছাড়া সকল মহিলাকে মা ও বোন হিসাবে দেখা উচিত।

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যায়। একমাত্র ভগবৎ প্রেমেই মায়ের ভালোবাসা অপেক্ষা উচ্চতর, আর সব ভালোবাসা নিম্নতর। মাতার কর্তব্য প্রথমে নিজ সন্তানদের বিষয়ে চিন্তা করা তারপর নিজের বিষয়ে। কিন্তু তা না করে যদি পিতামাতা সর্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন তবে ফল হয় এই যে পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখি ও তার ছানার সম্বন্ধের মত। পাখির ছানাদের ডানা উঠলে তারা আর বাপ মাকে চিনতে পারে না । সেই মানুষই বাস্তবিক ধন্য, যিনি নারীকে ভগবানের মাতৃভাষা প্রতিমূর্তিরূপে দেখতে সমর্থ। সেই নারী ও ধন্য যার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পির্তভাবের প্রতীক। সেই সন্তানরাও ধন্য যারা তাদের পিতামাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের সত্তারূপে দেখতে সমর্থ।

মহাভারতের একটি শিক্ষামূলক গল্প বর্ননা করা হল যা মানুষের কর্ম সম্পাদনের দ্বারা মানুষের উচ্চ আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যে উপনিত করে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক যুবক সন্যাসি একটি গৃহে ভিক্ষার জন্য এসে বলল মা আমেকে কিচু ভিক্ষা দিন। ভিতর হত বলতে লাগল 'নহতভাগিনী, তোর এতদূর স্পর্ধা ! তুনি আমাকে অপেক্ষা করতে বলিস ? এখানে তুই আমার শক্তি জানিস না। তিনি মনে মনে এইরূপ বলছিলেম, আবার সেই কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল 'বৎস ! এত অহঙ্কার করিও না এখানে কাক বা বক নেই। তনি বিস্মিত হলেন তখন তাঁহাকে অপেক্ষা করতে হল । অবশেষে সেই নারী বাইরে আসলেন, যোগী তাঁর পদতলে পড়ে বললেন, 'মা' আপনি কিরূপে ওটা জানলেন ? তিনি বললেন বাবা আমি তোমার যোগ - তপস্যা কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্য নারি। তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেম, কারণ আমার স্বামী পীড়িত; আমি তাঁর সেবা করছিলাম, সারাজীবন আমি কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি । বিবাহের পূর্বে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মাতাপিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য পালন করেছি এখন বিবাহিত হয়ে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করছি। এটাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য করে আমার জ্ঞান চক্ষু খুলেছে তাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরন্যে তোমার কৃত সমুদয় বভাপার জানতে পেরেছি। এরথেকে উচ্চতর কিছু জানতে চাও তো অমুক নগরের আজারে যাও সেখানে এক ব্যাধকে দেখতে পাবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দেবেন যা শিক্ষা করলে তোমার পরম আনন্দ হবে। সন্ন্যাসী ভাবলেন ঐ নগরে একটা ব্যাধের কাছে কেন যাব? কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখলাম তাতেই তাঁর কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হয়েছিল। সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নগরের নিকট এসে বাজার দেখতে পেলেন। সেখানে দূর থেকে দেখলেন এক অতি স্থুলকার ব্যাধ বসে বড় ছুরি নিয়ে মাংস কাটছেন, নানা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন ও কেনা বেচা করছেন। যুবক ভাবল হায় ভগবান রক্ষা কর এই লোকের কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে। এতো দেখছি একটা পিশাচের অবতার। এরই মধ্যে লোকটি চোখ তুলে বলিল 'সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন? আমার বেচা কেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করে একটু বসুন। সন্ন্যাসী ভাবলেন এখানে আমার কি হবে? যাইহোক তিনি উপনিবেশন করলে। ব্যধ নিজ কাজ করতে লাগল। কাজ শেষ হলে সে টাকাকড়ি সব নিয়ে সন্ন্যাসী কে বলল। আসুন মহাশয় আমার বাড়িতে আসুন, গৃহে উপনিত হলে ব্যাধ তাঁকে একটি আসন দিয়ে বলল। আসুন হাশয় আমার বাড়ীতে আসুন, গৃহে উপনিত হলে ব্যধ তাঁকে একটি আসন দিয়ে বলল। একটু অপেক্ষা করুন। তারপর বাড়ির ভিতর গিয়ে তঁ!আর পিতামাতার আত পা ধুয়ে দিলেন তাঁদেরকে খাওয়ালেন সকল প্রকার সন্তোষ বিধান করলেন। তারপর সন্ন্যাসীর কাছে এসে একটি আসনে উপনিবেশ করে বললেন। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন বলুনআমি আপনার কি করতে পারি ? তখন সন্ন্যাসি তাঁকে আত্মাও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন তার উত্তরে ব্যাধ যে উত্তর দিল, মহাভারত গ্রন্থের অংশ রুপে তা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদন্ত - দর্শনের চরম সীমা। তোমরা ভগবদ্গিতার নাম শুনেছ তা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করে এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। এটি বেদান্ত দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।

ব্যাধের উপদেশ শেষ হলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হল এবং বলল। আপনার এত উচ্চ জ্ঞান তাও আপনি এই ব্যাধ দেহ অবলম্বন করে এরুপ কুৎসিত কর্ম করছেন

কেন ? তখন ব্যাধ উত্তরে বলল 'বৎস কোন কর্মই সস্য নয়, কোন কর্মই অপবিত্র নয়। এই কাজ আমার জন্মগত এটা আমার প্রারব্ধ লব্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা লাভ করি অনাসক্তভাবে আমি আমার কর্তব্যগুলি ভালোভাবে করার চেষ্টা করি। আমি গৃহস্থোর ধর্ম পালন করি ও পিতামাতার যথাসাধ্য সুখী রাখার চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি না এবং সন্ন্যাসী ও হইনি। আমি কখন সংসার ত্যাগ করে বনে যাইনি। তাও সমাজে আমার অবস্থা অণুযায়ী কর্তব্যন অনাসক্তভাবে করায় আমার এই জ্ঞান জন্মিয়েছে। আমরা নিজের সম্পর্কে যথাযথ ভাবি, আমাদের কর্তব্য গুলি আমাদের গূনদ্বারা নিরুপিত হয়। প্রাতযোগিতা শত্রু উৎপন্ন করে এবং হৃদয়ের কোমলতা কে বিনষ্ঠ করে।যদি আমরা কোন জুয়ারী কে দেখি তাহলে দেখব যে সে সর্বদা হতাশার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে যারা জেতার আকাঙ্খা তার মধ্যে সর্বদা। তআই বলতে পারি ফলের আকাঙ্খা না করে কাজ করলেই আমরা আলোর দিশা দেখতে পাব।

কর্মযোগের ইচ্ছা শক্তিই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করে। সকল শক্তি ও মহত্ব মানুষের কর্মশক্তিকে জুগিয়ে থাকে এবং ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মে দ্বারা তার চরিত্রকে প্রকাশ করে থাকে। কর্ম হল ঢেউ এর মত তারা ছোট হলেও ধ্বংস হয় না একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বড় ঢেউ তৈরি করে। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের বড় ঢেউ এর উদাহরণ হল গৌতম বুদ্ধ, যিশু খ্রীষ্ট প্রভৃতি।

সাধারণ ভাবে মানুষের সমস্ত কর্মই স্বার্থ ছাড়া পরিচালিত হয়। স্বার্থছাড়া উৎপন্ন কর্ম তৎক্ষনাত ফল প্রদান করে। কখনই মানুষের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটায় না। আর এই স্বার্থযুক্ত কর্মের দ্বারা ব্যক্তির নৈতিক শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকে। নৈতিক শক্তির প্রকাশ পায় স৭ ভালোবাসার দ্বারা। এই নৈতিক শক্তি অর্জন করতে গেলে ব্যাক্তিকে আধ্যাত্মিকতার উন্নতি ঘটাতে হবে। এটাই হল কর্মযোগের মূল আদর্শ। কিন্তু এর অন্তিম পর্যায় অত সহজ অন্তিম পর্যায় পৌছান সম্ভব। তবে কর্তব্যের সংজ্ঞা ব্যক্তিভেদে হয়। স্বার্থহীন কর্তব্যই মানুষকে উন্নত ঘটায় যা কর্তব্যরত নারী ও কসাই এর গল্পে উল্লেখ আছে।

এটা অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে কর্তব্য কখনই কপটতা, ভন্ডামি, শোষন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। কর্তব্য কখনই বন্দী গৃহের মত নয়। মানুষ যত উচ্চ ইচ্ছা শক্তিকে জাগাতে পারবে এবং নিজের স্বার্থপরতাকে দূর করতে পারবে ততই তার

টিপ্পনী

জীবনের উন্নতি ঘটবে।

ঈশ্বর ভালোবাসা ও ঈশ্বরে সমর্পনই একমাত্র ভালো কর্মযোগীর উদাহরণ হতে পারে না। এমনকি যে সমস্ত ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নেই তারাও আদর্শ কর্মযোগী হতে পারে যদি তা প্রকৃত ভালোবাসা ও ভালত্ব দিয়ে পরিচালিত হয়। ব্যাক্তি নিচের শর্তগুলির দ্বারা আদর্শ কর্মযোগী হতে পারে।

টিপ্পনী

বারংবার ভালোকর্মের ছাবা মানুষ এমন এক পর্যায়ে উন্নিত হে সেখানে অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত হবে।

সে তুচ্ছ ইচ্ছা ও উচ্চ আকাঙ্খা থেকে দূরে থাকবে।

তার মধ্যে দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটবে।

অন্যান্ন যোগের মত স্বাধীনতা হল কর্মযোগের গুরুত্ব পূর্ণ আদর্শ। এটি স্বার্ধপরতার ধারণা থেকে মুক্ত করে।আমরা এখন স্বাধীনতার আদর্শের ছায়া নিয়মের ধারণা ও স্বাধীনতাকে বুঝব।

নিয়ম এবং স্বাধীনতা :

কর্ম শব্দটি কাজ ছাড়াও নৈতিকতার নিত্যতার নিয়ম কে নির্দেশ করে। যার প্রয়োগ হল কার্য কারণের নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে অপরিহার্য পর্যায়। এই নিয়মের অর্থ হল একটি ঘটনাকে বারংবার পুনঃরাবৃত্তি ঘটানো। খুব ভালোভাবে বলা যায় এই প্রবণতাটি প্রকৃতির চেয়ে মনের মধ্যেই বেশি আছে। একটি ঘটনা যা একটির পরে অন্যটি বা একই সঙ্গে ঘটতে থাকে এবং একটি অপরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নীতির দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং এইভাবে আমাদের মনে সম্পূর্ণ একটি ক্রমের ধারনা তৈরি করে একেই বলেই নিয়ম। কার্যকারণ সম্বন্ধই হল সকল নিয়মে মূল নিয়ম।

এই জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকই এই আসক্তি ত্যাগ করতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে আসক্তি ত্যাগের দুটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। একটিকে বলে নিবৃত্তি মার্গ এতে 'নেতি নেতি' (ইহানয় ইহানয়) করে সবত্যাগ করতে হয়। আর একটিকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ এটাতে ইতি ইতি কক্ষে সকল বস্তু গ্রহণ করে তার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। এটা কেবল উন্নতমনা অসাধারণ প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁরা শুধু বলেন, না আমি এটা চাই না

শরীর ও মন তাদের আজ্ঞা পালন করে; এবং তাঁরা সাফল্যমন্ডিত হন কিন্তু এদরূপ মানুষ অতি বিরল। অধিকাংশ লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ - সংসারের পথই বেছে নেয় এবং বন্ধন গুলিকেই ঐ বন্ধন ভাঙ্গার উপায় রূপে ব্যবহার করে। এও এই একপ্রকার ত্যাগ তবে ধীরে ধিরে ক্রমশ ত্যাগ করাহয়। সমস্ত পদার্থকে জেনে ভোগ করে, অভিজ্ঞতা লাভ করে। সংসারের সকল বস্তুর প্রকৃতি অবগত হয়ে মন অবশেষে ঐ গুলি ছেড়ে দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্ত লাভের প্রথমোক্তমার্গের -সাধন - বিচার, আর শেষোক্ত পক্ষের সাধন - কর্ম ও অভিজ্ঞতা। প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, কোন প্রকার কর্ম করতে অস্বীকার করাই এই পক্ষের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, এ পথে কর্মের বিরতি নেই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যাক্তিকেই কর্ম করতে হবে। কেবল যাঁরা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত যাঁরা আত্মা ব্যতিত আর কিছুই চায় না, যাঁদের মন কখনো আত্মা হতে আর কিছুই চায় না, যাঁদের মন কখনো আত্মা হতে অন্যত্র গমন করে না, আত্মাই যাদের সর্বস্ব, শুধু তাঁরাই কর্ম করিবেন না। অবশিষ্ট সকলকে অবশ্যই কর্ম করতে হবে।

একটি জলস্রোত স্বচ্ছন্দ গতিতে নামছে। একটি গর্তের ভিতর পড়ে ঘূর্ণিরূপে পরিণত হল, সেখানে কিছু কাল ঘুরবার পর ওটা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বার হয়ে দুর্বার বেগে প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মনুষ্য জীবন এই প্রবাহের মতো। এই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে নাম রুপাত্মক জগতের ভিতর পড়ে হাবুডুবু খায়; কিছুক্ষণ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ প্রভৃতি বলে চিৎকার করে অবশেষে বার হয়ে নিজের মুক্ত ভাব ফিরে পায়। সুন্দর জগৎ এটাই করছে। আমরা জানি বা না জানি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, আমরা সকলেই জগৎরূপ স্বপ্ন হতে বার হওয়ার জন্য কাজ করছি। সংসার আবর্ত হতে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা।

অনাসক্তিই হল স্বাধীনতার পথ :

জগতে স্বাধীনতা পেতে হলে একমাত্র উপায় হল অনাসক্তি কষ্ট আসে , আসক্তি এবং অকৃতকর্ম থেকে আমিও আমার ভাবই সকলম দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হতে স্বার্থ আসে এবং স্বার্থপরতা থেকে দুঃখ আরম্ভ। প্রতিটি স্বার্থপর কার্য বা চিন্তাই আমাদের কোন না কোন বিষয় আসক্ত করে এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর দাস হয়ে যাই। চিত্তের যে কোন তরঙ্গ হতে - 'আমি ও আমার' ভাব উত্থিত হয়, তা তৎক্ষণাৎ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ক্রীতদাসে পরিণত করে। যতই আমরা 'আমি ও আমরা' বলি ততই দাসত্ব বাড়তে থাকে তত দুঃখ ও বাড়তে থাকে। অতএব কর্মযোগ বলে জগতে যত ছবি সবগুলি সৌন্দর্য উপভোগ কর কিন্তু কোনটি সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলনা। 'আমরা' কখন বলো না। আমরা যখনই বলি এটা আমরা তখনই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসবে। আমার সন্তান - একথা মনে মনে বলো না। সন্তান কে আদর কর, তাকে নিজের আয়ত্তে রাখ কিন্তু আমরা বলো না।আমার বললেই দুঃখ আসবে। 'আমার বাড়ী', আমার শরীর', এরূপ ও বলে না। কারণ এই শরীর তোমারও নয় আমরাও নয় কারও নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসছে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যুক্ত সাক্ষীস্বরূপ। একখানি ছবি বা দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে শরীরের তদপেক্ষা বেশি নেই। একটা শরীরের প্রতি আমার এত আসক্ত হবে কেন ? যদি কেই একখানা ছবি আঁকো সেটি শেষ করে অণ্যটিতে হাত দেয়। আমি ওটা অধিকার করব - বলে স্বার্থজাল বিস্তার করো না।যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয় তখনই দুঃখ আরাম হয়।

সংসারে গিয়ে যতপার কর্ম কর সর্বত্র গিয়ে মেলামেশা কর, যেখানে ইচ্ছা যাও, মন্দের স্পর্শ কর তোমাকে কখনই দূষিত করতে পারবে না।পদ্মপত্রে জল রয়েছে, জল যেমন কখনো ওতে লিপ্ত হয় না তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকবে, এটাই বৈরাগ্য বা অনাসক্তি।মনে হয় তোমাদের বলা হয়েছে যে অনাসক্তি ব্যতীত কোন প্রকার যোগই হতে পারে না।

ঈশ্বরে বিশ্বাসই হল অনাসক্তির সহজ উপায় :

সকল আসক্তি ত্যাগ করার দুটি উপায় আছে। একটি যারা ইশ্বরে অথবা বাইরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না। তারা নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাদের নিজেদের ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করে কর্ম করতে হয় তাদেরকে জোর করে বলতে হবে। আমি নিশ্চয় অনাসক্ত হব। অন্যটি যারা ঈশ্বরের বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে এটা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁরা কর্ম বা সমুদয়, ফল ভগবানে অর্পন করে কাজ করে যান, সুতরাং কর্মফলে আসক্ত হন না। তাঁরা যা কিছু দেখেন অনুভব করেন, শোনেন সবই ঈশ্বরের জন্য। আমরা যেকোন ভালো কাজ করি না কেন, তারা জন্য আমরা মোটেই কোন প্রশংসা যা সুবিধা দাবি না করি। এটি প্রভুর সুতরাং

কর্মের ফল তাঁকেই অর্পন কর। আমাদের একধারে সরিয়া দাঁড়ায়ে ভাবতে হবে আমরা প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম প্রবৃত্তি প্রতি মুহুর্তে তা থেকে আসছে। যা কিছু কাজ কর যা কিছু ভোগ কর। যা কিছু দান কর, যা কিছু তপনস্যা কর সবকিছুই ঈশ্বরে অর্পন করে শান্তভাবে অবস্থান কর। আমরা নিজের যেন সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ওসব কিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য কাল প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে যজ্ঞ করার পরিবর্তে অহোরোহ এই ক্ষুদ্র 'অহং' কে আউতি দানরূপ মহাযজ্ঞ কর। জগতে ধর্ম অন্বেষণ করতে গিয়ে একমাত্র ধনস্বরূপ তোমাকেই পেয়েছি তোমারাই চরনে নিজেকে সমর্পন করলাম। জগতে একজন প্রেমস্পদ খুঁজনতে গিয়ে একমাত্র প্রেমাস্পদ তোমাকেই পেয়েছি তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম। দিবারাত্রি আবৃত্তি করতে হবে; আমার জন্য কিছুই নয়, কোন বস্তু শুভ অশুভ যাই হোক না কেন আমার পক্ষে সবই সমান। আমি কিছুই গ্রাহ্য করিনা, আমি সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম।

টিপ্পনী

১.৪. প্রশ্নমালা :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২. স্বামী বিবাকানন্দ রমকৃষ্ণ মীশন প্রতিষ্ঠা করছেন কেন?

৩. ব্যক্তির ব্যবহার মানুষের মনে কিভাবে প্রভাব ফেলে?

৪. কর্মযোগের মূল কাজ কি?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'কর্মযোগ' আলোচনা কর।

২. বস্তুগত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপর বিশ্লেষণ কর।

৩. ভগবদ্ গীতা অনুসারে কর্মযোগের ধারণা বিশ্লেষণ কর।

৪. সাংখ্যদর্শনের ধারণা আলোচনা কর।

টিপ্পনী

একক - ২ :: স্বামী বিবেকানন্দ (জ্ঞানযোগ)

২.০. ভূমিকা :

টিপ্পনী

বিবেকানন্দকে এমন একজন গুরুত্ব পূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় যিনি পাশ্চাত্য জগতে হিন্দু দর্শনকে তুলে ধরেছেন ।তাঁর দর্শনতত্ত্ব ও ভাবাদর্শন সমসাময়ীক ভারত বর্ষের রাজনৈতিক ধারণা কে প্রভাবিত করছিল।

বিবেকানন্দের মানবধর্ম তত্ত্বটি প্রমাণ করেয এ একজন ব্যাক্তির মধ্যে কেবল নিজস্বতাই থাকে না তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও বর্তমান। তিনি বিশ্বাস ককরতেন যে শিক্ষাই এমনই গুরুত্বপূর্ণ যা মানুষের উন্নতি ঘটায় । মানুষের উন্নত গুণের জন্য শিক্ষাই একমাত্র প্রয়োজন। এই গুণটি হল এমন সত্ত্বা যা সমাজে তার চরিত্রকে বিচার করবে।

স্বামি বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরই হল জগতের অন্তিম সত্ত্বা এবং জ্ঞানযোগের ধারণা কে উপস্থাপন করেছেন তাঁরর্ত্মের ধারণাটির অর্থ হল এমন অণুভব যা তাঁরা দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করা।

এই এককে শিক্ষাই মানুষকে তৈরি করে এমন ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। এই এককে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা এবষং রামকৃষ্ণ মিশনের মূল লক্ষ্য কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরেই রামকৃষ্ণ মিশনের এখানেই মানুষের মধ্যে জাতীয় উন্মেষ ঘটে।

২.১. মানুষের প্রকৃত প্রকৃতি :

যোগের চারটি পথের মধ্যে জ্ঞান যোগ হলল সবথেকে গুরত্বপূর্ণ। এটি হল জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞার যোগ। এর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হল মহৎ অভ্যাস ও ইচ্ছাশক্তি। এটি নিজের প্রকৃতির পরিচয় ঘটায় এবং অহংচিন্তা ও মনের মধ্যে সম্পর্ক ঘটায়।

স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতন যে শিক্ষা হল এমন সাধন যা

টিপ্পনী

মানুষকে উচ্চতর স্থানে নিয়ে যায়। তিনি সাধারণ মানুষের শিক্ষার অবনতি দেখে ভীষণভাবে দুঃখ পেতেন। তিনি ভীষণভাবে তাঁর পশ্চিমী পক্ষপাত হতে শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। এর কারণ হল মানুষের মধ্যে মানসিক সক্ষমতার অভাব এবং নৈতিক চরিত্রের অভাব। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষাব্যবস্থা আবার পুনরায় সজ্জিত হোক। তিনি ঘোষণা করেচিলেন যে আমাদের জীবন গঠন, মানুষ গঠন ও চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন ধারণার সমাহার থাকা প্রয়োজন। যদি শিক্ষা বিভিন্ন সংবাদএর সঙ্গে একই হয় এবং লাইব্রেরী যদি শিক্ষা বিভিন্ন সংবাদএর সঙ্গে একই হয় এবং লাইব্রেরি যদি হয় মহান তভাগি এবং তাহলে শব্দভন্ডার হবে ঋষিগণ। পুঁথিগত শিক্ষা ও স্মৃতি শিক্ষা যে বিবেকানন্দ উপহাস করেছেন। শিক্ষা কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণে তথ্যের সমাহার নয়। স্মৃতিতে একত্রিত হয়ে বদহজম হয়ে জীবনভার বহন করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধিও করেছিলেন আমরা এই শিক্ষাই চাই যার দ্বারা চরিত্রের গঠন হবে, আমনসিক শক্তি বদ্ধি পাবে, বুদ্ধি প্রসার ঘটবে এবং পরিশেষে মানুষ যার দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

মানসিক চরিত্রের বিচার করবে :

স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন "যদি তুমি প্রকৃতই মানুষের চরিত্র বিচার করতে চাও তাহলে তার মহৎ কার্য বা উপলক্ষ্য করল।" তার সাধারণ কাজ কর্মের লক্ষ্য কর। এই গলোই বলে দেবে মানুষটির আসল চরিত্র। মহান মহান ঘটনা গুলি উচিত হয় সাধারণ মানুষের অসাধারণ কর্মের ছায়া। কিন্তু সে সর্বদই হান যার চরিত্র সর্বদা মহানতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁর মতে বোধশক্তিই সবথেকে উচ্চ জ্ঞান হতে পারে না। নৈতকতা ও আধ্যাত্মিকতা এই দুটিরজন্য আমরা সংগ্রাম করি। তনি বলেছেন 'আমাদের স্ত্রীলোকেরা খুব শিক্ষিত নয়, কিন্তু তারা অনেক বেশী শুদ্ধ'। একজন মানুষ কিছু পরীক্ষায় পাস করল বা ভালো বক্তৃতা দিলে তার উপর তিনি শিক্ষার বিবেচনা করতেন না। সকল পদ্ধতির মূল হল সামাজিক, রাজনৈতিক নয় মানুষের ভালোত্বের উপর।

হৃদয়ের উন্নতিসাধন :

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছলেন এটাই হৃদব বা মনুষকে উচ্চস্থানে নিয়ে যায় কিন্তু যেটা বুদ্ধি কখনোই পারে না, তাই সর্বদা হৃদয়কে নিয়ে চর্চা করতে হবে। তিনি সবসময় গরীবদের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য এবং একের জন্য অন্যের সহানুভূতির উপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বেদান্তদর্শন তাঁকে এই শিক্ষায় প্ররোচিত করে যে শিক্ষা অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম যা প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র হওয়ার পেছনে এক করে এবং অবশ্যই সেইসব মানুষের থেকে আলাদা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে ভীষণভাবে হীনতম।

বিবেকানন্দ স্মরন করিয়েছিলেন যে দেশ এখনো কূঁড়েঘরের মধ্যে রয়েছে এবং সেইজন্য প্রত্যেক ইক্ষিত নবীনদের কর্তব্য যে এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে যাওয়া এবং প্রতিটি লোককে আসল অবস্থা বোঝানো - তথা তাদের ঘুম হতে জাগিয়ে তোলা এং তাদেরকে তাদের দুর্দশাগ্রস্থ জীবন হতে মুক্তিপথের সন্ধান দেওয়া সেই অসহায়, ডুবে যাওয়া দুর্দশাগ্রস্থ মানুষকে জীবজীশক্তি দিতে হবে যাতে তারা শারীরিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হতে পারেরে। তিনি বলেছিলেন আমি তাকে মআত্মা বলে যে গরীবদের জন্য ভাবে অণুভব করে। এইসব লোকজনই হল ভগবান তাদের সম্পর্কে ভাব, তাদের জন্য কাজ কর। তাদের জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা কর - ঈশ্বরই তোমাকে পথের সন্ধান দেবে।

বিবেকানন্দ ধারনার - মানুষের দ্বারা সৃষ্ট শিক্ষা :

স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন দারিদ্রের মধ্যে ঐশ্বরিকতা" - যাকে তিনি বলতেন দরিদ্র নারায়ন। তিনি নর্দেশ করেছিলেন মানুষের দ্বারা তৈরি শিক্ষা ।এটি বভখ্যা করে শিক্ষা উন্নতি লাভ করে সেবামূলক কর্মের দ্বারা এং দরিদ্র প্রয়োজনীয় মানুষকে সাহায্য করা উচিত যাতে করে তারা উন্নত বিশ্বধর্মসভায় ১৮৯১ সালে শিকাগোতে স্বামীবিবেকানন্দ মানুষের দ্বারা তৈরী শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন। এগুলি ছিল সাহায্য, আত্তঈকরণ, সমন্বয় এবং শান্তি। সাধারণতঃ শীক্ষা এই সকল গুণগুলি মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে।

টিপ্পনী

মানুষের দ্বারা সৃষ্ট শিক্ষা চরিত্র গঠনের মধ্যে সহহাত এবং বৃত্তিমূলক উন্নতির ও সহায়ক। মানুষ দ্বারা সৃষ্ট শিক্ষা হল বিস্তৃত ধারনা।

মানুষের দ্বারা সৃষ্ট শিক্ষার মধ্যে শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সংযুক্ত হয়। তিনি ভীষণভাবে শরীরের প্রতি যত্ন ও দেহের উন্নতির জন্যেও যত্নের কথা বলেছেন।

টিপ্পনী

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ধারণা নীচে উল্লেক করাহল।-

- স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে বেদান্ত দর্শনই মানুষদের জীবনে অন্তিম লক্ষ্যে পৌছাতে পারে যেখানে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ব হত পারে। এটি প্রটিটি মানুষ কে বোঝা উচিত।
- মানুষের সেবাই হল ঈশ্বর সেবা। স্বামীজির মতে ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের বাস করে। তাই প্রতিটি মানুষকে সেবা মূলক কাজ বাড়ানো উচিত।
- স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের উদার ধারনাকে বিশ্বাস করতন। প্রত্যেক ধর্মের সারকথা এক। কোন ধর্ম অন্য ধর্ম হতে শ্রেষ্ঠ নয়। মানুষের প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
- বিবেকানন্দের মতে ভালবাসাই হল ধর্মের মূল লক্ষ্য। মানুষের উচিত ভালবাসা গ্রহণ করা এবং কাউকে ঘৃণা না করা।
- বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করাতে চেষ্ট করেন। মানুষের উচিত বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান অর্জন করা।
- স্বামী বিবেকানন্দ মানুষেদর ভবিষ্যৎদ্রষ্ঠা ছিলেন।তাঁর মানুষের প্রতি ধারণা পূর্ব ও পশ্চিমের অতিক্রম করে যায়। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ এবং বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক মানুষের যুক্তিবাদী মনোভাব এ উন্নতি হওয় উচিত।
- মানুষের দ্বারা সৃষ্ট শিক্ষা মানুষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায়। তাই মানুষ নীতিগতভাবে উন্নত হয়, বুদ্ধিদীপ্ততে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, শারীরিকভাবে শক্ত, ধর্মীয়ভাবে মুক্তচিন্তাভাবনা যুক্ত, সামাজিকভাবে দক্ষ ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হয়ে ওঠে এবং বৃত্তইমূলকভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।
- স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ এবং মীশন প্রতিষ্ঠা করেন, যে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে

মানুষ গড়ার কাজ নিরন্তর ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এটি বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, পড়াশুনার ঘর, হাসপাতল ও ঔণষধালয় এর সঙ্গে জড়িত। শত শত মানুষ আপামর জনগণের সেবায় নিরোদৃত হয়েছে যাদের মূল উদ্দেশ্য মানবজীবনের উন্নতি সাধন করা।

টিপ্পনী

২.৩. সার্বিক ধর্মের মূল কথা / যে পথে সার্বিক ধর্মকে উপলব্ধি করা যায়:

বিবেকানন্দর দর্শন এবং তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশিষ্ট অর্থনীতিও শিক্ষাবিদ V.K.R.V রাও কিছু শব্দের দ্বারা সারসংক্ষেপ করেছেন।

ঈশ্বরই হল একমাত্র জগতের সৎবস্তু এবং সেই হল সার্বিক সত্ত্বা। সকল অবভাস, সজীব ও জড়। আনুষ এবং প্রানী, দেহ, মন ও আত্মা সবকিছুই ঈশ্বর সৃষ্ট। সেজন্য মানুষে মানুষের প্রাধমিক সত্ত্বার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এবং সকল মানুষের অনুভূতি ও একে অপরের প্রাত ব্যবহার নির্দেশ করে তারা নিজেরাই ব্যক্তিগত সত্ত্বা। মানুষের প্রকৃত সত্ত্বা বলতে বোঝায় ঈশ্বর, যদিও অজ্ঞ মানুষ মায়া বা ছায়া আবৃত থাকে বেদান্তের এই বিষয়ে বলা হয়েছে এই আবরণ ছিন্ন করতে পারলেই তারা প্রকৃত সত্তা কে উপলব্ধি করতে পারবে। এটা সম্ভব সংযোগ ও জ্ঞাযোগের শিক্ষা ও অভ্যাসের ছায়া।

বেদান্ত দর্শন কেবলমাত্র অদ্বৈত মত উপস্থাপন করে না। এটা ঈশ্বর উপলব্ধির দুটি পক্ষের সন্ধান দেয় - নিজস্ব ঈশ্বর পূজা ও 'ইস্থা যোগ' দ্বারা কারণ এটা মানুষের সবচেয়ে কাছের ও প্রিয় মানুষকে ভালবাসার উপর সুবিন্যস্ত হয়েছে এবং এদর জন্য সে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ কতর্ধাকে গুরু হিসাবে খুজে পায়। একই সময়ে সে নিজেকে উপযুক্ত হিসাবে গ্রহণ করে এবং এক স্থান থেকে অনভ স্থানে যাওয়ার অনুপ্রেরণ পায়। যখন কোন মানুষ এই পর্যায় পৌছায় সে ঈশ্বরে জন্য অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা পূর্ণ করে পারে এবং সে বীশ্বজগৎ কে ঈশ্বর রপেই উপলব্ধি করে এবং সকল মানুষের জন্য সে লক্ষ্য করবে কিন্তু তার নিজস্বপ্রকাশ পাবে। তার ধর্ম এইভবে সকল মানুষের ভালোবাসার ছায়া পরিচালিত হবে এবং ঈশ্বর আরাধনার মধ্যে দিয়ে তার কর্ম

টিপ্পনী

লক্ষ্য করা যাব।এখানে স্বাধীনতা যুক্তি প্রাপ্তের তৃতিয় পদ্ধতিটি শৃঙ্খলাবদ্ধ নিজ এবং ঈশ্বরচেতনা পৌছানোর মধ্যে। এটাই হল কর্মযোগ। বেদ কর্ম হল সংযুক্ত ও স্বার্থহিনতা ত্যাগ এবং সহকর্মীদের কাজের মধ্য দয়ে। যদি একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে কর্মযোগের পথ অনুসরণ করে তবুও সে স্বাধীন যুক্তি ও শান্তিতে পৌছাতে পারে যেমন -গৌতম বুদ্ধ। এখানে বুদ্ধ শিক্ষা যুকত, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ এর ক্ষেত্রে দয়া, সমকর্ম হল বিশেষত। সর্বশেষ বলতে পারে যে সকল শিক্ষা জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন এমন সত্যিকারে উদাহরণ হল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ধর্মর অর্থ হল সাধনা বা উপলব্ধি :

বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম শুধু বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। 'ধর্ম' তাঁর মতে সাধনা বা উপলব্ধি কথা নয়। মতামত নয় তত্ত্ব নয় যদিও তারা সৌন্দর্যপূর্ণ হতে পারে। এটা একটা স্তআ কোন শ্রবণ ও স্বীকারোক্তি থেকে আসে নি। এটা সমগ্র আত্মাকে পরিবর্তন করে দেয় এবং সেটাই হল বিশ্বাস, এটাই ধর্ম। ধর্ম হল অভ্যাস যদি এর কোন অর্থ থাকে এবং সেটা হবে সামাজিক সত্তার অভভাস। ১৮৯৪ সালে ২৭ অক্টোবর ওয়াসিংটন এক চিঠিতে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছিলেন এমন কোন ঈশ্বর অথবা ধর্মে বিশ্বাস করি না সেটা বিধবাদের চোখের জল মোছাতে পারে না এবং অনাথ দেদর মুখে একখন্ড রুটি বা জোগাড় করতে পারে ন। তাও যতই উন্নত হোক না কেন বা দর্শন যতই ইভালো কর্ততি হোক না কেন, যতই এটা বই বা নীতির মধ্যে আবদ্ধ হোক না কেন আমি এটাকে ধর্ম বলে মানব না। চোখ সর্বদা কপালে ধাকে পিছনে থাকে না, সমানের দিকে এগিয়ে চল, এবং অভ্যাসে পরিণত কর যেখানে তোমার ধর্মকে বলতে তুমি গর্ব অনুভব কর।

ধর্মের উপর বিবেকানন্দের শিক্ষাদানের মূল নীতি ছিল ঈশ্বরের সর্বজণীনতা এবং আকার ও আকারহীনতায় অভিগম্যতার উপর। মানুষের ঈশ্বরকতৃত্ব, সমস্ত ধর্মের শ্রদ্ধা ও বোঝার উপর সকল মানুষের সাম্যতা ও ভাতৃত্ব বোধের উপর সহানুভূতির সর্ব্বোচ্চ গুণের উপর। সংযুক্তিবিহিন ভাবে কাজে উপর নিজস্ব আত্মঅহংকারে আত্মত্যাগ ছাড়াই ভক্তির উপর এং সমস্ত মানুষের সেবার উপর

শুধুমাত্র তাই যারা গরীব অথবা শারীরিক অক্ষম অথবা অশিক্ষিত অথবা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত - এই জগৎ দরিদ্র নারায়নের উপর।

নীতি নৈতিকতা হল জীবনের মূল ধর্ম :

টিপ্পনী

সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত পদ্ধতির মূল মানুষের ভালোত্বের উপর নির্ভর করে। কোন দেশ আইন সভার আইন জারির নির্দিষ্ট নীতির উপর ভালো বা মহৎ হয়ে ওঠে না। কিন্তু মানুষের ভালো ও মহত্বের উপর নির্ভর করে। জনসাধারণ প্রাই কাজ করে একই গল্প লাভ করে কিন্তু তারা প্রকৃত ঘটনা জানতে ব্যর্থ হয়। একজন অবশ্যই নীতি, সরকার, রাজনীতি, এগুলিকে অধ্যায় হিসাবে স্বীকার করবে কিন্তু এগুলই শেষে নয়। এখানে একটা উদ্দেশ্য আছে যেখানে আইন প্রয়োজন নয়, সমগ্র সহ্য মানুষরা একই শিক্ষাই দিয়েছেন যিশু খ্রিষ্ট দেখেছিলেন যে আইনের মূলতাই প্রাথমিক নীতি নয় - নৈতিকতা ও শুদ্ধতাই হল আসল সত্য।

এই জগতের মূল শক্তি :

ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ সমস্ত নীতির মূলম উদ্দেশ্য তা বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন আমি নই কিন্তু তুমি এবং এইভাবে আমি হল অণির্দিষ্ট ভেতর হতে উদ্ভুত যা সর্বদা এষ্টা করে চলেছে বর্হিজগৎ থেকে বিভিন্ন সম্পাদন করতে। এই হোস্ট 'আমি' হল ফল এবং একে পুনরায় ফিরে যেতে হবে এর প্রকৃতিরাজ্যে এবং সেই অনির্দিষ্টের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। প্রত্যেক সমরে তুমি বলবে, আমি নই আমার ভাই, কিন্তু তুমি - তুমি চেষ্টা করছ। ফিরে যাবার এব প্রত্যেক সময় তুমি বলবে 'আমি' - তুমি নও। তুমি ভুল পদক্ষেপ নিয়েছো এই বোধযুক্ত পৃথিবীতে কার্য সম্পাদন করার জন্য। এটাই সংগ্রাম বহন করে। নিয়ে আসে এবং এই পৃথিবীর ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু একটা সময়ের পরে মোক্ষলাভ অবশ্যই হবে - শ্বাশ্বত মোক্ষলাভ। ছোট্ট আমিতখন হয় মৃত এবং লুপ্ত। কেন আমরা আমাদের জীবনের উপভোগ করার জন্য ইচ্ছা এখানে বা অন্য কোনো স্থানে সমাপ্তি ডেকে আনে।

যদি আমরা কোনো পশুর সমতুল্য হয়ে নীচে নেমে যাই, তাহলে আমরা এই বাঁধন হতে মুক্তি পেয়ে যাই। কিন্তু আমরা কখনোই সম্পূর্ণভাবে সেই আসম্পূর্ণকে

টিপ্পনী

সম্পূর্ণ করতে পারি না। আমাদের উচিত বেশি পরিমাণে সংগ্রাম করো কিন্তু এখানে কোনো এক সময়ে এমন সময় আসবে তখন আমরা দেখতে পাব যে এখানে সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব যখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হই আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। তখন আমাদের ফিরে যায় তার আগেকার আসন অসম্পূর্ণ অবস্থার এবং সেটি তখন পুনঃজাগরিত হয়।

এটাই হল মোক্ষপ্রাপ্তি। আমাদের উচিত এই কঠিনতাকে অতিক্রম করা সংরক্ষণ পদ্ধির মধ্য দিয়ে যার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের দান দাক্ষিণ্য এবং নৈতিকবোধকে জাগ্রত করব।

বিবেকানন্দের দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য :

বিবেকান্দের দর্শনের মূল নীতিগুলি নীচে বর্ননা করা হল -

- বেদান্ত মানবজাতির উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা সত্তার মূল্য গঠন করে।
- উপনিষদ শিক্ষায় আমাদের সামাজিক সমস্যার সমাধানের যথেষ্ট শক্তি আছে।
- মানব সত্তাই হল ঈশ্বরে প্রাত মূর্তি।
- প্রতিটি ধর্মের মূলনীতি হল এক।
- আত্মা হল প্রকৃত সত্তা।
- কর্মযোগ হল নৈতিকতার নিয়ম এবং আত্মসংযোগ ও আত্মউপলব্ধির জন্য ধর্মের প্রয়োজন।
- মানবজাতির সেবাই হল ধর্মের সর্বচ্চ মূল লক্ষ্য।
- প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করে।

বিবাকানন্দের শিক্ষাগত দর্শন :

বিবকানন্দের শিক্ষাগত দর্শন দশটি শব্দেদর মধ্যেই উল্লেখিত 'শিক্ষাই মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণতার বিকাশ ঘটায়'। সমস্ত জ্ঞ আন, সংসারী অথবা আধ্যাত্মিক মানুষের মনের মধ্যে। মানুষ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায় এবং নিজেকে আবিষ্কার করে যেতা প্রাক অস্তিত্ব থেকে অনন্যকাল ঘুরতে ধাকে। আমরা শক্তি তাকেই বলি যা প্রকৃতির

মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যেমন আগুন অগ্নিপ্রস্তের অংশ, জ্ঞান ও মনের মধ্যে অস্তিত্ব যান ; বিভিন্ন সংঘাত তার প্রকাশ ঘতে। বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন - 'জ্ঞান মানুষের সহজাত, কোন জ্ঞান বাইরে থেকে আসেনা, এটি সবই অন্তবর্তি। আমরা মানুষকে কি বলি জানি সেটা যথাযথ মনোবিদ্যাগত ভাষা, সে কি রূপে আবিস্কার অথবা প্রকটিত হয়। মানুষ কি ?

টিপ্পনী

আমরা বলি নিউটনন মধ্যাকর্ষন শক্তি আবিষ্কার করেছেন। এটা কি কোন নিরিবিলি জায়গায় বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল ? এটি ছিল তাঁর নিজের মনে এবং সময় আসার সঙ্গে সঙ্গে তা বার হয়ে এসেছে।এই জগতের সমস্ত জ্ঞান মনের মধ্যে থেকেই আসে। বিশ্বজগতের অসীমের জ্ঞান ও আমাদের নিজেদের মনগত। এই বাহ্য জগতের অভিজ্ঞান ও ঘটনা সব কিছুই তুমি তোমার নিজের মনের অধ্যায়ন। আপেল পড়া থেকে নিউটনের যে ভাবনা তা তাঁর মন অধ্যায় থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর মন অধ্যায়ন থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর মনের চিন্তন গুলিকে নতুন করে সাজিয়ে সে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন যাকে আমরা মধ্যাকর্ষন নীতি বলি। এটা কোন আপেল ও না আবার পৃথিবীর কেন্দ্র ও নয়।

২.৩.১. রামকৃষ্ণ মিশন :

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছায়া অনুপ্রানিত হয়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয় জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন একজন মহৎ হিন্দু ধর্মেদর ছায়া যুক্তি বা অন্বেষণ করেছেন। তার অন্বেষিত চিন্তা এই গতানুগতিক পথে -

(১) পুনর্জন্মলাভ

(২) ভক্তি ধ্যান

যে মুসলিম ও খ্রীষ্টান ও অন্য বিশ্বাসের প্রতি অতীন্দ্রীয়বাদী। তিনি বারংবার ঈশ্বরের বিভিন্ন পথের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা এর মধ্য দিয়ে উত্তর পেয়েছেন মানুষই হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ তাঁর মহৎ বুদ্ধি ও ক্ষমতার ছায়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার বিস্তার ঘটান। মিশনের মূল লক্ষ্য ছিল

পাশ্চাত্য সভ্যতার জড়বাদীর প্রভাব থেকে ভারতকে রক্ষা করা। এটা হিন্দুবাদের আদর্শ এবং বহুঈশ্বরবাদের পূজার অনুশীলন। এবং লক্ষ্য হিন্দুবাদের মধ্যে দিয়ে জগৎকে আধ্যাত্মিক জয় লাভ করা।

টিপ্পনী

বিবেকানন্দ সামাজিক কর্মের উপর জোর দিয়েচেন। তিনি ধর্মপ্রিয় সমাজের উপর ধারণা প্রদান করেন। তিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্মীয় মহাসভায় যোগদান করেন এবং বিশ্বের শিক্ষিত ব্যাক্তির সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছে। তার বক্তবে সকলেই অনুপ্রাণীত হয়েছে কারণ তাঁর যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার উপর। তিনি পাশ্চাত্যে বলেছেন প্রত্যেক ব্যাক্তির লক্ষ্য তার স্বাধীনতার তার 'অর্থ' (টাকা) তৈরি করে। তার শিক্ষাই তার নীতি গঠন করে যাইহোক ভারতে প্রত্যেকের লক্ষ্য হল মুক্তি অথবা আত্মউপলব্ধি। বৈদিক ভাষা আত্মত্যাগের কথ বলে থাকে।

সকল ধর্মের সমতার প্রাত তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ধর্মপদ সংকীর্ণতার বিষয়ে তিনি কঠোর করে নিন্দা করতেন। একই সময়ে তিনি ভারতীয় উচ্চ দার্শনিক ঐতিহ্য কে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বেদান্তকে সম্মতিদান করেছেন এবং এটিকে বৌদ্ধিক পদ্ধতি হিসাবে ঘোষণা করেন।

বিবেকানন্দ অণুভব করেছেন ভারতবর্ষের প্রকৃতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োজন। তিনি জাতি বিভাজন এবং হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান রীতি ও কুসংস্কারকে গভীর ভাবে নিন্দা করেছেন। তিনি আত্মার স্বাধীনতা, মমতাও যুক্ত চিন্তা মন মধ্যে গ্রহন করার জন্য জনসাধারনকে আহ্বান করেছেন।

বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মহৎ মানবতাবাদী। দেশের জনগণের দারিদ্রতা, দুঃখ, কষ্ঠ তাকে স্পর্শ করে যেত। তিনি বলেছিলেন শিক্ষিত ভারতীয় 'বহু লক্ষ লক্ষ ক্ষুদার্থ ও অজ্ঞ মানুষ আছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আছে এবং এরা বিভিন্ন সামাজিক সেবা মূলক কাজ যেমন - স্কুল, হসপিটাল , অনাথআশ্রম, গ্রন্থাগার করে মানুষের সাহায্য করেছে।

২.৪. প্রশ্নমালা :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মানুষ কে বিচার করার মূল উপায় কি ?

২. বেদান্ত দর্শনের গুরুত্ব কি ?

৩. বিবেকানন্দের মতে ধর্ম কি ?

৩. কর্মযোগের মূল লক্ষ্য কি ?

রচনাধর্মি প্রশ্ন :

১. জ্ঞানযোগের ধারণাআলোচনা কর।

২. বিবেকান্দের মতে শিক্ষাই মানুষের উন্নতি সাধন ঘটায় এটি ব্যাখ্যা কর।

৩. বিবেকানন্দের দর্শনের মূল লক্ষ্য কি আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একক ৩ : ড. বি. আর. আম্বেদকর - ১

টিপ্পনী

ভূমিকা :

বি. আর. আম্বেদকর একজন বিশিষ্ট ভারতীয় আইনগত, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ, পন্ডিত এবং বিপ্লবী হিসবাএ পরিচিত। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী।

বি. আর আম্বেদকর নীচু জাতির হওবার জন্য তাঁকে অনেক অসম্মান ও বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়েছে। নীচু জাতিকে উন্নত পর্যায় পৌছানোর মূল প্রয়াশ দিল এটাই। তিনি সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতির রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য প্রচুর নীতি তৈরি করেছেন।

আম্বেদকর শান্তির পথধরে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য গণতন্ত্রকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতা তভাগের জন্য নানান উপায় প্রবর্তন করেন।

আম্বেদকর গণতন্ত্র ব্যবস্থাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন কেননা এতে বেশি সংখ্যক মানুষ সরকারি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং এটিতে অধিক সুযোগের প্রতিযোগিতা পরিবর্তনকে নিশ্চিত করে।

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর :

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ১৮৯১ সলে ১৪ ই এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের ইন্দরের জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা সেখানকার আর্মি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার চৌদ্দতম পুত্র। তাঁর পাঁচবছর বয়সেই মাতা গত হন এবং তিনি পিতা ও ভগীনী মিরাবাই এর কাছে প্রতিপালিত হন। ভীমরাও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এটা মহারাষ্ট্রের বড় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়। কিছু পন্ডীতের মতে সহারা শিল মহারাষ্ট্রের প্রকৃত ঔপনিবেশিক যারা আর্যদের আক্রমণের শিকার

ছিল।

ভীমরাও এর পরিবার ছিল সৈনিক পরিবেশের। তাঁর বাব রামজী সকপাল এবং ঠাকুরদা মূলজী সকপাল ব্রিটিশ সেবিত সৈনিক ছিলেন ।তাঁর মাতা ও সৈনিক পরিবারের ওনার পিতা সুবেদার প্রধান মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মুরদ গ্রামের বাসিন্দা।

টিপ্পনী

ভীমরাও পরিবার মহারাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূলথেকে বাহির ছিল এবং সকল বৈষম্য অক্ষমতাকে সহ্য করত।

যুবক ভীমরাও কে লোকাল মারাঠী স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল যেখানে তার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল ভীম রামজী আম্বেদকর। পৈতৃক সুত্রে ও বংশগতভাবে জাতি ছিল তার পদবী। পরবর্তি সমবে ভীম সাতবার সরকারী স্কুলে উচ্চস্কুল শিক্ষা শুরু করেন। স্কুলে অন্য অস্পৃশ্য ছেলেদের মত সেও পৃথকত্বের শিকার ছিল। তাঁকে অন্যছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলা ও বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষক তাকে সংস্থৃত শিক্ষা প্রদান কে অস্বীকার করেছিলেন কারণ অস্পৃশ্য ছেলেদের সংস্কৃত শিক্ষার যোগ্য বলে মনে করা হত না। যদিও ভীম সংস্কৃত শিখতে চেয়েছিল কিন্তু পরিবর্তে তাকে ফার্সি শিখতে জোর দেওয়া হয়।

১৯০৪ সালে রামজী সকপাল চাকরীর পরিসমাপ্তির পর মুম্বাই চলে যান। যদিও ওনার পরিবার পারোলের চাওয়াল এ বসবাযস করত । এই সময়ে ভীম পারেলের হাইস্কুলে বদলি হয়ে যায় এবং পরবর্তিকালে এলফিসটোন হাইস্কুলে বিখ্যাত হন। ১০৯০৭ সালে এখানথেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন।

এটা মনে রাখা দরকার যে গতানুগতিক নিয়মানুসারে ভীম চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর নববধু ভিকু ভলগাকরের কন্যা রমা বাই এর বয়স তখন নয় বছর।

মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় এর বরদা শাষন কালে আমসিক ২৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে এলফিসটোন কলেজে ভীমরাও শিক্ষালাভ চালু রাখেন। মহৎ অধ্যাপক ম্যক্স মুলার ভীমরাওকে বই ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি কলেজে ধাকা অবস্থাতেই পিতাহন। ওনার প্রথম পুত্র শিবন্ত। তিনি ১৯১৩ সালে ইংরাজী ও ফার্সী এই

দুটি মূল বিষয় নিয়ে বি. এ. পাশ করেন।

স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর বরদা রাজে চাকরিতে যোগদন করেন।এখানে তাঁর অনেক অপমান সহ্য করতে হয় এর জন্য তাঁর পদত্যাগ ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ তিনি অবিচার ও অসম্মান সহ্য করতে পারতেন না।

১৯১৩ সালে উন্নত পড়াশোনার জন্য বিদেশে সুযোগ পান। তিনি ইউএসএ (USA) নিউ ইয়র্কের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইকোয়াড় বৃত্তি নিয়ে নিযুক্ত হন এবং অত্যন্ত দ্রুত বিদেশী পড়াশুনাতে যুক্ত হন। ১৯১৫ সালে তিনি এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। কলম্বিয়াতে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছিল প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতি। ১৯১৬ সালে 'National Dividend for India'গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়ে Ph. D তে নিবন্ধিত হন।ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণমূলক পড়াশোনার দ্বারা ১৯১৭ সালে জুন মাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph. D ডিগ্রী গ্রহণ করেন।

১৯১৬ সালে অক্টোবর মাসে তিনি কলোম্বিয়া থেকে লন্ডন এ ইকোনোমিক্স এবং পলিটিক্যাল সাইন্সের স্কুলে যোগদান করে ইকোনোমিক্স এম. এস. সি ও সি. এ. সি তে যুক্ত হন। একই সাথে তিনি গ্রেসইন এ যোগদান করেন বার - ঐ - ল্(Bar - at - Law) ডিগ্রি পাওয়ার জন্য। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যা।বের অধ্যাপক আর. এ সেলেগম্যান এর সূচনাকারী পত্রের জন্য আম্বেদকর লন্ডনের একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পান।

যাইহোক বরদার মহারাজ আম্বেদকরে ফিরিয়ে এনে সামরিক বাইনীর সচিব হিসবে নিযুক্ত করেন ল কিন্তু সামরিক বিভাগে জাতি বিদ্বেষ ধাকার জন্য তিনি তীব্র বিরক্তিতে তাঁর চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর বোম্বে ফিরে এসে তিনি সাইডেমহাম কলেজ অফ কমার্স অ্যন্ড ইকোনমিক্স কলেজে মর্যাদাপূর্ণ ৪৫০০ টাকা মাসিক মাইনা নিয়ে পলিটিকভাল ইকোমিক্সের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। এমনকি এখানেও তিনি হিন্দু সহকর্মীদের দ্বারা জাতি বিদ্বেষের শিকার হন যার জন্য ১৯২০ সালে তিনি কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি আবার লন্ডনে ফিরে এসে পুনরায় উচ্চশিক্ষষা লাভে মননিবেশ করেন। লন্ডন পরিত্যাগ করার আগে তিনি 'লিডার অফ দ্যা ডাম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করেন যেখানে ভারতবর্ষের দলিত শ্রেণীর মানুষের সমর্থন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করেছেন।

১৯২৩ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং বম্বেহাইকোর্টে একজন আইনজীবী হিসাবে কাজ করার জন্য মনোনিবেশ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র একজন দলিত শ্রেণীর মানুষ হওয়ার জন্য তিনি ভালোভাবে অনুশীলন করতে পারতেন না। সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য তিনি আইনশিল্পের আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে বাটলিবাই ইনসিউট অফ অ্যাকাউন্ট অফ অ্যাকাউনটেন্সি তে যুক্ত হন।

১৯২৪ সালে আম্বেদকর তার রাজনৈতিক কর্মজীবন আরম্ভ কচরেন। এই সময়েই তিনি বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন যেটি আসলে ছিল দলিত শ্রেনীর হিতকর্ম জনিত সংস্থা এটি দলিত শ্রেনীর শিক্ষা ও চিন্তাভাবনাকে নবজাগরণের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তিনি দলিতশ্রেণির সুখ দুঃখ জানার জন্য একটি সংবাদপত্র শুরু করেন যার নাম ছিল 'বহিস্কৃত ভারত'।

১৯২৭ সালে তিনি মুম্বাইয়ের বিধানসভা কাউন্সিলিং সদস্য পদে মনোনীত হয়েছিল। পরবর্তি বছরে তিনি মুম্বাইয়ের গর্ভমেন্ট ল্ কলেজে আইনের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। লন্ডনে অনুষ্ঠিত সেকেন্ড রউন্ড টেবিলের যে সভা অণুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি অস্পৃশ্যদের কথা উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৩২ -৩৩ সালে লন্ডনে আম্বেদকর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক এর উপস্থাপন করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে জুনমাএ মুম্বাইয়ে গভর্মেন্ট ল্ কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং একই সঙ্গে আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া গর্ভমেন্ট তাঁকে এক্সিকিটিভ কাউন্সিল অব দ্যা গর্ভনর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার প্রধান কার্যনির্বাহি সদস্য হিসাবে মনোনীত করে শ্রমিকদের দাবিত্ব দেন। এই পদটিতে তিনিই ১৯৪৬ সালে জুলাই মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন।

১৯৪৬ সালে তিনি কনস্টিউট অ্যাসেমলি অফ্ ইন্ডিয়া তে বাংলার পক্ষ মনোনীত হন যদিও মহারাষ্ট্র তার জন্মস্থান রাজ্য তবুও বাংলার লোকেরা তাকে মনোনীত করে। সুতরাং তিনি প্রেসটিজিয়াস ডাক্টটিং কমিটির সভাপতি হিসাবে কনস্টিউট অ্যাসেমলিতে মনোণীত হন। এবং এইভাবে তিনি কনস্টিউয়েট অ্যাসমব্লি

এর শেষ খসড়া সূচনা রেন যা ভারতবর্ষের সংবিধান রচনায় তাকে সাহায্য করে। এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন বিধান গুলির সংশোধনেও সাহায্য করে। এইভাবে সংবিধান রচনাতে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন তাতে তাঁকে সার্বজনীন ভাবে ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতার জনক বলে অভিহিত করা হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষ বিদেশী শক্তি ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর জহরলাল নেহেরু তাকে আইনের মন্ত্রি হিসাবে মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তাঁকে মনোনীত করেন। একবছর পরে তাঁকে তাঁর চাকরি পদত্যাগ করতে হয় কারণ ভয়ঙ্করভাবে হিন্দু কোড বিল নিয়ে জহরলালের সঙ্গে তার মতান্তর ঘটতে আরম্ভ করে। যাইহোক ১৯৫২ সালে তিনি রাজ্যসভা হতে মনোনীত হন এবং এই সম্মানীয় পদে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে পর্যন্ত টিকে থাকেন।

১৯৪৮ সালে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ডঃ আম্বেদকর মহারাষ্ট্রে এক ব্রাহ্মণের কন্যা ডক্টর সারদা কবিরকে জাতপাত জনিত অদ্ভুত প্রতিশোধের জন্য বিবাহ করেন। এবং এইমেয়েটি তাঁর সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত একসঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেন।

আম্বেদকরের লৌকিক জীবনের উন্নতি পর্ব :

- ১৯১৮ - ১৯২৮ এই সময়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন আইনজীবি হিসাবে এবং অস্পৃশ্য শ্রেণির রক্ষার্থে সত্যাগ্রহের উচ্চে পৌছেছিলেন।
- ১৯২৯ - ১৯৩৬ এই সঞ্চয়ে তিনি দলিতদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি তোলেন।
- ১৯৩৭ - ১৯৪৬ এইজ সময়ে তিনি জনসাধারণে অফিস দখিল করেন অস্পৃশ্য শ্রেনীর সুবিধার্থে।
- ১৯৪৬ - ১৯৫০ এই সময়ে তিনি ভারতীয় সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন এবং তার নাম দেন মর্ডান মনু।
- ১৯৫০ - ৫৬ এই সময়ে তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

এইভাবে ডঃ আম্বদকর ছিলেন একজন বিখ্যাত আইনজীবী, আইনপ্রণেতা,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সংবিধান রচয়িতা, মন্ত্রীসভার সদস্য, সামাজিক সংশোধমক এবং দলিতদের মুকুটহিন রাজা। ভারতবর্ষের অসহায় এবং শোষিত শ্রেণী যাদের মুক্তির ও ভালোর জন্য এবং যাদের উন্নতির জন্য তিনি বেঁচেছিলেন এবং সর্বশেষে মারা গেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা তাঁকে ভূষিত করেচিল দলিতসমাজের বিখ্যাতি হিসবে। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত স্থলতিকচর কারণ তিনি ভারতের সংবিধান রচনা করেছেন তার তাঁর এই বহুমুখী ব্যাক্তিত্ব তাকে 'ভারতরত্ন' ভূষিত করেছে।

সামাজিক ধারণা :

'মেহের' হিসাবে ডঃ আম্বেদকর সমাজের অণ্যজাতির মানুষের কাছ থেকে প্রচুর বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন এবং সেইজণ্য তিনি সর্বদা ভারতবর্ষের সামাজিক ধারা পরিবর্তন করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি সর্বদাই জাতপাত এবং সমাজের ব্রাহ্মণ শ্রেনীর দাসত্ব থেকে নিশেষিত এবং শোষিতদের উদ্ধার করার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এটা শুধুমাত্র সম্ভব দলিত ও শোষিত শ্রেণীর মানুষদের প্রেষ্টার দ্বারা কারণ অধিকার কোনোদিন দয়া দাক্ষিণ্য বা দানের দ্বারা সম্ভবণয়। বাল গঙ্গাধর তিলকের মতোন তিনি ভাবতেন যে একজনকে যুদ্ধ করতে হবে তাদের জন্য, জারি করতেহবে তদেদর জন্যই এবং এই কারণের জন্যই একজনকে লড়তে হবে সেই প্রচলিত সামাজিক কাঠামো ঐতিহ্য এবং অভ্যাস এবং বিশ্বাসের প্রতি।

হিন্দুদের অণুক্রম / নির্দেশের অসুবিধা :

আম্বেদকর এর কাছ একদম প্রথম অসুবিধা ছিল হিন্দুদের সামাজিক পদ্ধতিবিন্যাস বা ধারাবিন্যাস যা শুদ্রদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। আম্বেদকর তার বইতে উল্লেখ করেছেন যে এই ধারাবিন্যাসের মূল ভিত্তি যেখান থেকে এই অসমনীতা আরম্ভ হয়েছে তা হল চারটি বর্ণ অনুযায়ী কে কোন্ জীবনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতামত অনুসারে আর্য সমাজের লোকেরা একদল প্রথম থেকেই ইন্দো আর্য সমাজে চারটে বর্নতে বিশ্বাস করত। তাঁরা বিশ্বাস করত যে বেদ হল শাশ্বত এবং অলঙ্ঘনীয়। আম্বেদকর ভেবেছিলেন বেদের কিছু অংশ, অবশ্যই বলতে গেলে ব্রাহ্মণদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল

যাতে করে ব্রাহ্মণরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। তাঁর মতে আর্যসমাজের লোকেরা খুবই ভুল করে এটা প্রচার করে যে বেদ হল শাশ্বত যার কোনো শুরু নয়, যার কোন শেষ নেই এবং যা অবর্থ। এইরকম পর্যবেক্ষণের ফল হল হিন্দু সমাজ একটি স্থির সমাজ।

প্রকৃত তিনটি বর্ণ পদ্ধতি এবং শুদ্রদের উৎপত্তি :

আম্বেদকর মতে শুদ্রদের সম্পর্কে ঘোষণা :

- শুদ্র হল আর্যসমাজের একমাত্র সৌরগতি।
- একসময় ইন্দো- আর্য সমাজে কেবল তিনটি র্ণ বভবস্থা ছিল সেখানে শূদ্র কোনপৃথক বর্ণ নয় এটি ছিল ক্ষত্রিয়দের অংশ মাত্র।
- তখন কিছু সময়ের শুদ্ররাজা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে লড়াই শুরুহয় যেখানে শুদ্ররা অনেক অত্যাচার ও অমর্যাদার স্বীকার হয় এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণী থেকে বহিঃস্কৃত হয়।
- ব্রাহ্মণরা শুদ্রদের ঘৃণা করত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত ও অমর্যাদার সঙ্গে তাদের কোন পবিত্র কাজ ধেকে বিতারিত করা হত।
- পবিত্র কাজ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য শুদ্ররা সামাজিক ভাবে অবহেলিত হতে এবং এর ফলে তারা বৈষ্যদেদর পক্ষে স্থানপায় ও সমাজের চতুর্থস্থানে তারা চলে আসে।

শূদ্রদের অবস্থান :

আম্বেদকর নিম্নে শুদ্রদের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন তিনি।

- তিনি সামাজিক স্বীকৃতির সবশেষে অবস্থান পেতেন।
- তিনি অপবিত্র হিসাবে বিবেচিত হত যার ফলে কোন পবিত্র কাজ দেখা ও শোনার কোন অধিকার ছিল না।
- তিনি অন্য কোন শ্রেণীর কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতেন না।
- তাঁর জীবনের কোন মূল্য দিল না তাঁকে যে কেই মারতে পারত তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পেত না যদিও পেতে তাও দিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈষ্যদের তুলনায় অনেক কম।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- তিনি জ্ঞান অর্জন করতে পারতেন না, তাঁকে শিক্ষা প্রদান ছিল পাপ ও অপরাধ।
- তিনি সম্পত্তি অর্জন করতে পারতেন না, তাঁর সম্পত্তি ব্রাহ্মনরা নিয়োজিত তাদের আনন্দেরজন্য।
- তিনি রাজ্যের কোন আফিসে স্থায়ী হতে পারতেন না।
- তাঁর কর্তব্য ও যুক্তি লাভ ছিল উচ্চ শ্রেণীর সেবার দ্বারা।
- তিনি দাসত্ব করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন এবং চিরজীবন দাসত্বই করতে হবে।

জাতি নিয়মের দূর্ভাগ্য :

আম্বেদকর একটি লম্বা দুর্ভাগ্যের তালিকা তৈরি করেছেন যদি হিন্দু জাতি নিয়মকে দূষিত করেছে। তারমধ্যে কয়েকতা -

- এই জাতির সদস্যরা তার যেখানে তার জন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
- এই জাতির সদস্যদের অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ছিল।
- এদের হাতিয়ার অধিকারের নিষিদ্ধ ছিল । সুতরাং এরা কখনই অত্যাচারী শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রহ করতে পারত না।
- তাদের শিক্ষাদানের অধিকার অস্বীকার করা হত ।তারা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।
- তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজের নিয়োগ হল নিয়োগ হত পিতা মাতার সামাজিক দেখে। তাদের পেশার কোন পুনর্বিন্যাস হত না। অবস্থান জাতির জন্য বেকারত্ব কে মুখ বুজে সহ্য করতে হত।

ভারতবর্ষে কোন কোন সামাজিক আন্দোলন হয়না তা আম্বেদকর খুব সাহসিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যদিও ভারতবর্ষে সামাজিক ব্যবস্থায় জাতগত বৈষম্য লক্ষ করা যায়। তিনি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষরা নিম্নশ্রেণির মানুষদের চালাকির ছায়া অক্ষম করে রেখেছে। সমাজের নিম্ন শ্রেনীর মানুষরা উচ্চ বর্ণের ব্যাক্তিদের থেকে নিজেদের যুক্ত করতে না পেরে দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয় ।এরা সমাজের চাকরি, ভোটাধিকার

শিক্ষা প্রভৃতিতে স্বীকৃতি পায় না চতুর্থবর্ণের এই নিয়মের জন্য শুদ্ররা সম্পূর্ণ পঙ্গু থাকে। এর থেকে মুক্তির কোন পথ নেই।

আম্বেদকর চিন্তা করেছিলেন দলিত শ্রেণীরা এর থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হল -

টিপ্পনী

- শাস্ত্রে যেখানে জাতি গত বিষয় আছে তা ধ্বংস করা প্রয়োজন।
- বর্ণ প্রথাকে বিলুপ্তি ঘটানো দরকার ।ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ব্যাক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে উৎসাহ দেওয়া উচিত যাতে বর্ণ বিদ্বেষ না থাকে।
- শিক্ষার উপর ব্রাহ্মনদের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হওয়াউচিত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সবার সমান ছিল।
- শুদ্রদের সকলের মত সমান ভোটাধিকার থাকা উচিত এবং এদেশ ওন ভোতের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকার থাকা উচিত। যাতে করে তারাও সরকার নির্বাচন করতে পারে।

ডঃ আম্বেদকর নীম্নলিখিত পরামর্শগুলি তৈরী করেন যাতে করে হিন্দু ধর্মের সমস্ত নিষ্ঠুরতা বা অমানুষিকতা দূর হয়ে হিন্দুধর্ম একটি বিশুদ্ধ ধর্মে পরিণত হয়।

- সমস্ত হিন্দুদের দ্বারা গৃহীত একটি মাত্রই হিন্দুধর্মের এই হওয়া উচিত। অন্যদিকে কোনো মতবাদ ধর্ম যা বেদে, শাস্ত্রে অথবা কোনো পুরাণে আছে তা যদি কেউ প্রচার করে তাহলে তাকে দন্ডিতকরা উচিত।
- পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজ থেকে বিলুপ্ত হওয়া উচিত। বংশগত ভাবে পুরোহিত হওয়া বন্ধ করা উচিত। রাজ্যে পুরোহিত নির্বাচনের পরীক্ষা হওয়া উচিত।
- এটা দন্ডযুক্ত হওয়া উচিত একজনের ক্ষেত্রে যার কোনো সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী নেই একজন পুরোহিত কিনাসেটা প্রমাণ করার জন্য।

সামাজিক ন্যায়পরতা :

অসংখ্যদলিত শ্রেনীর মানুষের স্বাধীনতা ও সংহতির জন্য আম্বেদকরই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নয় কিন্তু তিনিই প্রথম তাদের জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ

টিপ্পনী

করেন। গুণগত ভাবে তাঁর কাজ অন্যদের থেকে অনেক উন্নত। তিনি লক্ষলক্ষ দলিত শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক যুক্তি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রজনৈতিক অগ্রগতির জন্য পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দলিত শ্রেনীর মানুষদের বুঝিয়েছিলেন যে অসাম্যতা এবং ন্যায়পরতারপ্রতি বাধ্য না হতে।

ডঃ আম্বেদকর বর্তমান ভারতবর্ষে ব্রহ্মন্যবাদের বিরোধীতা করে নতুন সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ জাতীয়তাবাদি জাগরণ এবং গণতান্ত্রিক সচেরনতার ক্ষেত্রে আম্বেদকর বার্তা সমাজকে নতুন দিশা দেখান যে বিষয়নিয়ে বহুকাল অবধি কোন মানুষ চিন্তাই করেনি। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য নিজেরমধ্যে একজন সামাজিক সংস্কারক, একজন রাজনৈতিক নেতাএবং আধ্যাত্মিক পদপদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের সম্প্রদাবের জন্যে তিনি অন্যরকম ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যেখানে তিনি মানসিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কে পরিবর্তন করেছেন।

আম্বেদকরের অর্থনৈতিক উন্নতি ও তার পছন্দের ওপর মতামত:

অধ্যয়ন বিষয়ক অর্থনীতিবিদ্ হওয়ার জন্য আম্বেদকর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়।আগেকার সময়ে অর্থাৎ (১৯১৫ - ২৫) তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিল শুধুমাত্র জনগণের আর্থিক সংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্পর্কে। কিন্তু তার অর্থনীতি সম্পর্কিত লেখা যা পরর্বিকালে ভীষণভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত লেখা যা পরবর্তীকালে ভীষণভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বভাপার নিবে আলোচিত হয়েছে - যেগুলি হল অর্থনীতি সংক্রান্ত উন্নতি ও তার নকশা, অর্থনীতির পদ্ধতি ও জাতপাত গত বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতি। সত্যিকথা বলতে গেলে প্রত্যেকের অধিকার সমাজের অর্থনীতির গঠনগত দিকেদর উপর নির্ভর কতে তিনি সর্বদা সামাজিক ও অর্থনীতি বিষয়ে জোর দেওবার কথা বলেছেন কারণ তাতে একটি মসৃণ গণতন্ত্র গঠিত হয়। তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন যে যেখানে বাহ্য অবশ্যই প্রাথমিকভাবে শিল্পকে রক্ষা করবে এবং অর্থণীতির শোষণ এতে

ভীষণভাবে প্রতিকৃত করা যাবে। তিনি অর্থনীতি জনিত নকশা সুপারিশ করেছিলেন। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, তাঁর রাজ্যের সমাজতন্ত্রের ওপর ধারণা ছিল সাংবিধানিক রাজ্য সমাজতন্ত্র যা ছিল সাংসদীয় গনতন্ত্র। এই ধরনে মিলনক্ষেত্র ভীষণভাবে প্রয়োজন কারণ এটা নীশ্চিত করে যে সামাজিক ও অর্থনীতিজনিত সংস্থা হল সামগ্রিক এবং এইভাবে রাজনীতি মানে অনেক নীচু ও সুযোগসুবিধা বিহীন। গণতান্ত্রিক সমাজের উপর মডেল উপস্থাপন করা হয় ঐ নিতিগুলি হল -

- প্রতিটি ব্যক্তির প্রাথমিক স্বাধীনতা রাজ্যে সংবিধানের দ্বারা প্রদান করা।
- জমি সংক্রান্ত এবং তার কাজকর্ম বিষয় রাষ্ট্রের তত্ত্বআবধানের প্রয়োজন।
- ব্যাক্তিগত শিল্পের স্বীকৃতি হওয়া প্রয়োজন।
- অর্থনৈইক পরিকল্পনার প্রয়োজন।
- জাতি, শিক্ষা, ধর্ম নির্বিশেষে জনগণের মধ্যে বৈষম্যহীন সমাজ দরকার।
- গণতন্ত্র অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

আম্বেদকর সর্বদা গণতন্ত্র আমারজন্য সমাজতন্ত্রের উপর জোর প্রয়োগ করেন তিনি অণুভব করেছেন ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্খৃতিক ও বৌদ্ধিক ধারণার মধ্য দিয়ে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। উপরিউক্ত আলোচনাটি এটাই নির্দেশ করে যে আম্বেদকরের অর্থনৈতিক দর্শন মূল্যবোধ দ্বারা পরিব্যাপ্ত । তাঁর অর্থনৈতিক ধারনা গুলি দলিত ও শোষিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সুন্দর প্রচেষ্টা কেননা আম্বেদকর খুব কাছ থেকে পরিচিত ছিলেন এইসমস্ত মানুষদের সঙ্গে। এরজন্য তিনি ইতিমূলক মনোভাব নিয়ে মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক কষ্টের কথা ভেবেছেন।

আম্বেদকরের দার্শনিক ভূমিকা :

আম্বেদকরের দর্শনে একটি মৌলিক নীতি কারণের ক্ষেত্রে বিরাজ করত। তাঁর আত্মসমালোচনা, বিশুদ্ধ সাহিত্য এই নীতির উপর নির্ভরশিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দুরা এই কারণ থেকে মুক্ত নন। অন্যদিকে হিন্দুদের ব্যবহার নির্ধারিত হত মনুর বেদ,

টিপ্পনী

স্মৃতির এবং সদাচার এর ছায়া। তিনি লিখেছিলেনন বেদ ও স্মৃতি বুদ্ধিদিপ্তক নৈতিক আদর্শ হিসাবে নিরুপিত হয় কিন্তু এটি পুরোপুরি মানুষ দ্বারা নিন্দিত। মনে করা হয় যে নাস্তিকরা একটি বিশেষপূর্ণ। আম্বেদকরের মতামতে হিন্দু ধর্মে এই ধরনে প্রতিফলিত চিন্তা কম দেখা যায়।

টিপ্পনী

পবিত্র সাহিত্য ও হিন্দু নিয়মের অসমান্যতার ক্ষেত্রে আম্বেদকর বিরোধী ছিলেন। যদিও তিনি ভগবত গীতার শিক্ষাকে তাঁর জীবনের প্রাথমিক পাঠ গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালে তিনি গীতাকে সমালোচনা করছেন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসাবে বেদ ব্রহ্মসমাজকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

আম্বেদকর এবং বৌদ্ধধর্ম:

আম্বেদকর লক্ষ্য করছেন যে অস্পৃশ্যদের প্রকৃত প্রতিকার হবে হিন্দুধর্মে সমতা, ন্যায্যতা, দিয়ে জাতি পদ্ধতিতে শাসক ছায়া সামাজিক সম্পর্কের প্রতিস্থাপন করলে। তিনি বৌদ্ধ সামাজিক দর্শন কে গ্রহন করেন এবং বুদ্ধদেবের বর্ণনাতে তিনি বলেন তিনি বলেন তিনি হলেন মানুষের মহৎ শিক্ষক যিনি মানুষের মধ্যে ভালোবাসার মতবাদ প্রদান করেন। তিনি বুদ্ধকে আধুনিক ধর্মের যুগ বলেছেন অবশেষে এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

আম্বেদকর প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের উপর ভরসা করতেন কারণ তিনি জানতেন বুদ্ধদেব হল এমন এক দার্শনিক যিনি সামাজিক বিবর্তনের কথা বলেন এবং অস্পৃশ্য ও শুদ্রদের স্বাগতম জানিয়েছেন। আম্বেদকর বুদ্ধদেব পথে নিচু শ্রেণিতে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধ মানবতাবাদ আম্বেদরকে ভীষণ ভাবে আকর্ষন করেছেন এবং মাষ্টার হিসাবে তৈরি করেছেন। অনেক গবেষণার পর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং এটা বুদ্ধ ধর্ম এবং সঙ্ঘ ১৪ অক্টবর ১৯৫৬ সালে। বর্নধর্ম বলতে তাদের মতে ভাতৃত্ব সংস্কৃতি।

জাতের নির্মূলীকরণ:

ভারতীয় সমাজে জাতগতি হল একটি প্রাথমনিক প্রতিষ্ঠান। এটা সমগ্র ভারতীয় সমাজে পরিব্যাপ্তির রয়েছে এবং ভারতীয় সমাজে খুব কম জায়গাই আছে যা

জাতপাত দ্বারা পরিব্যপ্ত নয় । জাতপাত একটি নির্দিষ্টভাবে বা অনভভাবে প্রাথমিকভাবে উন্নত আকার, যা সর্বদাই জাতপাত ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে এতটাই অন্তরঙ্গ যে অনেকেই এই মত পোষণ করেন, জাতপাত ভারতীয় সমাজ সমসাময়িক। জাতপাতের যে বৈশিষ্ট্য আছে যা অতীত কাল থেকে চলে আসছে, তা সাধারণতঃ সাতভাগে বিভক্ত - যাজকতন্ত্র, অর্ন্তবিবাহ, সমান ঘরে অথবা উচ্চ শ্রেণি বা জাতিতে বিবাহ, জীবিকাজনিত সংযোগ, খাদ্যের উপর সীমাবদ্ধতা, পানীয় ও ধূমপান, রীতিনীর ওপর পৃথকতা, পোশাকও কথা, দূষণ ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনভান্য সুযোগ সুবিধা এবং অসমর্থতা, ধর্ম সংস্থা ও ধর্মের চলনশীলতা।

প্রচুর পরিমাণে তথ্যসমূহ যা জাতপাতের মূলকে নির্দেশ করে সেগুলি অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীর তথ্যে পাওয়া যায় । যাইহোক কেউই আজ অবধি সক্ষম হয়নি একটি সন্তোষজনক উত্তর দিতে যে জাতপাতের মূল কোথায় ? জাতপাতের নির্দিষ্ট গতিশীল প্রকৃতি ব্যর্থ করে সমস্ত প্রচেষ্টাকে যা পদ্ধতিকে বিশ্বজনীন করে তোলে। কিছু গবেষকরা বীশ্বাস করে যে জাতপাত ব্যবস্থাটি যবে ইন্দো - আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছে তখন থেকে এর উৎপত্তি।

যদিও অনেক হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনেক অণুচ্ছেদ আছে যা জাতপাতের পদ্ধতিকে ব্যাক্যা করে, সেখানে লিখিত আছে যে হিন্দুধর্মে জাতপাত প্রয়োজণীয় অংশ নয় পরবর্তিকালে শাস্ত্রসমূহ যেমন ভগবতগীতা এবং মনুস্মৃতি বর্ণনা করে যে, চারটি বর্ণ ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট। ঐতিহ্যগত তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, জাতপাত পদ্ধতি ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট বিধান। তত্ত্ব অনুযাবী জাতপাত পদ্ধতি হয় একতি সাধারণ এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতি। অন্যদিকে , অন্যভাবে বলতে গেলে সমাজতত্ত্ব মনে করে যে, জাতপাত পদ্ধতি মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট একটি স্তরবিন্যাস যেখানে পদমর্যাদা ও ভূমিকা 'জন্ম' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বর্ণপদ্ধতি :

সংস্কৃত শব্দ বর্ণ 'ভূ' নামক মূল শব্দ ধেকে এসেছে যার অর্থ 'পচ্ছন্দ'। এটা হল এই ধারনার বিপরীত যে বর্ণ নির্দেশ করে রঙ এবং কোনজনের নির্দিষ্ট কোন গুণকে। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণ শব্দটি চারটি সামাজিক শ্রেণিকে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শুদ্র। বৈদিক সময় কোনো কিছুই উচ্চ বা নিম্ন বর্ণ ছিল না। সমাজের বিভক্ততা চারটে বর্ণের মধ্যে অথবা চারটি ক্রম যেগুলি কর্মের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণরা পুরোহিতের কাছ করে, ক্ষত্রিয়রা দেশশাসন ও দেশকে রক্ষা করে। বৈশ্যরা ব্যবসায়িক কাজে সাহায্য করে ও শুদ্ররা সবাইয়ের সেবা করার কাজে নিযুক্ত থাকে। প্রত্যেকতি বর্ণ বিভিন্ন বেদী বা দেবদেবী পূজা করে ও বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে। এইপার্থক্য গুলির কারণ ছিল বিভিন্ন পেশা অণুযায়ি সমাজের বিভিন্ন বর্ণের নির্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণরা চাইতেন বেশিরভাগ পবিত্র দীপ্তি তার জন্য তারা অগ্নি অর্থাৎ আগুনের পূজা করত এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করত। ক্ষত্রিয়রা দেহগত শক্তি অর্জন করতে চাইত তাই তারা ইন্দ্রের পূজা করত ও ত্রিবুশ মন্ত্র জপ করত। বৈশ্যরা বভবসা বণিজ্যের জন্য গবাদী চাইতে তাই তারা বিশ্বদেবাকে পূজা করত এবং জাগতি মন্ত্র সমূহ উচ্চারণ করত। যাইহোক সমাজে এই ধরণের মানুষের মধ্যে বিবাহজনিত কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না এবং এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের দীক্ষা নিতে পারত।

সংরক্ষণের প্রশ্ন :

ডঃ আম্বেদকর এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন যে হিন্দু ও দলিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই ঠিক যেমনি কার্যকরীভাবে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে কোনো কিছুই সাধারণ নয়। যদি তা হয় তাহলে ইংরেজ্ সরকার নীতিগতভাবে মুসলিমদের মাঝেও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই ধরনের নির্বাচকমন্ডলী সৃষ্টি করতে পারত। ডঃ আম্বেদকরের মতে এখানে সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আলাদা নির্বাচকমন্ডলী থাকা দরকার। ঠিক যেমন মুসলিম ও শিখদের। আলাদা বা পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে পরিগণিত ধরা হয়। তাঁর মতে সমাজে যারা দলিত শ্রেণী তাদেরও আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে দেখা উচিত। তথাপি আলাদা নির্বাক মন্ডলী ও আলাদা সংবিধান ভারতের সরকারের সৃষ্টি করা উচিত যাতে করে ভারতবর্ষের দলিতও শোষিত শ্রেণীর জনগণ অবহেলিত না হয়। এই ব্যাপারটি গোল টেবিল বৈঠকে বিবেচিত হওয়া উচিত।

গান্ধীজির কাছাকাছি সবরমতি আশহরমে জি. রমা চন্দ্র রাও তাঁর বই নাম An

Aheist with Gandhi তে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যদি গান্ধীজী ১৯৪৮ সালে নিহত না ্তেন, যদি তিনি আরও কিছু মাস বা সময় বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো তিনি নাস্তিক হয়ে যেতেন।

চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আম্বেদকর গান্ধীজির থেকে আরও বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি এই ধারণা মনে মনে পোষণ করতেন যে যাদের বছরের পর বছর আলাদা করে রাখা হয়েছে তারা চিরকাল আলাদাই থেকে যাবে। তারা কখনোই হিন্দু সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারবে না অথবা ভারতীয় সমাজে মূল স্রোতেও ফিরে আসতে পারবে না শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীর মানুষে অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির ও মনোভাবের জন্য যা সর্বদাই যুদ্ধরত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

টিপ্পনী

প্রশ্নমালা :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বি. আর. আম্বেদকর নীচ জাতির পড়াশুনা কিভাবে চালিয়ে গেছেন।

২. 'শুদ্র' সম্পর্কে আম্বেদকর কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

৩. ধর্ম সম্বন্ধে আম্বেদকর কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

৪. বর্ন পদ্ধতি বলতে কি বোঝায়?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. আম্বেদকরের দর্শনের মূল অবদান আলোচনা কর।

২. আম্বেদকরের জীবনে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব আলোচনা কর।

টিপ্পনী

একক -৪ :ড. বি. আর. আম্বেদকর - ২

গঠন প্রণালী :

৪.০. ভূমিকা

৪.১. উদ্দেশ্য

৪.২. মহত্মা গান্ধী : সংক্ষেপে

৪.২.১. মহাত্মা গান্ধী : জীবন ও কর্ম

৪.২.২. গান্ধীবাদ : ধারনা ও আদর্শ

৪.২.৩. গান্ধী এবং অর্থনিতি

৪.২.৪. মানুষেদর জীবনের ঐক্য সম্বন্ধে গান্ধীর ধারণা

৪.৩. গান্ধীবাদি হিসাবে আম্বেদকর

৪.৪. অস্পৃশ্যতা

৪.৫. প্রশ্ন ও অনুশীলন

৪.০. ভূমিকা :

আমদের স্বাধীনতা সংগ্রামী একটি সংঘবদ্ধ ভারতিয় সমাএর এবং আরো চেয়েছিল যে প্রত্যেক ভারতবাসী যেন স্বাধিনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেয়। প্রত্যেকের ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করার প্রবোজন ছিল একটি ন্যয়পরায়ন ও সমানতান্ত্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তৈরির মধ্য দিয়ে। এজন্য তাঁরা সমাজের নীম্ন শ্রেণীর প্রতি বীশেষ নজর দিবেছিল। তাঁরা সমাজ থেকে খারাপ কাজ যথা অস্পৃশ্যতা, অপলাপ বন্ধ করতে চেয়েছিল।

ভারতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েছিলেন গান্ধিজী। জনগনের উপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর এবং ভারতনবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। গন্ধিজি প্রচার করেছিলেন যে যদি ভারতবর্ষে স্বাধীনতাকে যদি সুরক্ষিত কচরতে হব তাহলে অস্পৃষভতা এবং অনভান্য সামাজিক ব্যাধীকে দুর করা দরকার। গান্ধিজী সমাজের নীম্নশ্রেণীর দুর্দশার প্রতি ভাবিত ছিলেন এবং তাদেরকে উদ্ধারের ও চেষ্টা করতেন। তিনি অস্পৃশ্য মানুষদের নতুন নামকরণ করেছিলেন হরিজন বা ঈশ্বরের

টিপ্পনী

সন্তান এবং নিজেও তাদের সাথে বাস করতেন।

গান্ধিজী আবেদন করেছিলেন যাতে ভারতবর্ষের নীপিড়িত মানুষ শিক্ষিত হয় এবং মানবিক মূল্য বোধ ও সমানাধিকারে আগ্রহী হয়। এই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তারা যাতে অস্পৃশ্য বলে গণ্য না হয়, মন্দিরে পূজা দিতে পারে, নীম্ন জাতের মানুষের সন্তান যাতে স্কুলে পড়তে পারে, তারা যাতে কর্মস্থলে উচ্চ মর্যাদার পদ পায় তার জন্য চিরকাল সংগ্রাম করেন। যাতে নীচু বর্ণের মানুষ সমাজের উচু বর্ণের মানুষের সঙ্গে পা মেলাতে পারে তার জন্য গান্ধিজি তাদের বৃত্তি শিক্ষা দিতেন। সমাজের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের গরীব ও নীপিড়িত মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করার চাবিকাঠি প্রদান করতেন। তিনি এর জন্য 'সর্বোদয়' এর ধারণা পেশ করেছিলেন যা সমাজকে পুনগঠিত করবে বলে আশা করেছিলেন।

যদিও নীপিড়িত শ্রেণীর অনেকেই গান্ধীকে তাদের মুক্তির বাহক হিসাবে মানতেন তবুও অনেক মানুষ গান্ধীজির কাজের ফলের প্রতি সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। তেমনই একজন নীপিড়িত শ্রেণীর নেতা হলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। তিনি নিজেই একাকী নীপিড়িত সমাজের থেকে শ্রেণিবিভেদ ভেঙে উঠে আসতে চেয়েছিলেন। তিনি অণুভব করেছিলেন যে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিই সমাজের এই অনভায়ের মূল কারণ। সমাজের অত্যাচারিত মানুষের জন্য তিনি সর্বদা বেদনা অনুভব করতেন। তাঁর সমগ্র জীবনে তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন শ্রেণীর জাতের মানুষের ঢেউতুলতে চেয়েছিলেন যারা সকলকে একইভাবে মান্য করবে। তিনি বর্ণব্যবস্থাকে ভারতীয় সমাজের ঐক্যের প্রধান অন্তরায় বলে গণ্য করেছেন। সমাজ থেকে যাতে অস্পৃশ্যতা, দাসত্ব বন্ধ করা যায় এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এইলক্ষ্য পুরনের জন্য তিনি নীচু শ্রেণীর মানুষদের সমন্বিত করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন কেননা তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজের নীচু শ্রেণীর মানুষ ও যাতে দলবদ্ধভাবে যুদ্ধে সামীল হতে পারে। তাঁর মতে সামাজিক ন্যায় একাই সামাজিক ঐক্য এবং সামাজিক স্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে পাকরে। তিনি একটি সামাজিক ঐক্য এবং সামাজিক স্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি একটি সুগঠিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে

টিপ্পনী

একদিকে যেমন শান্তি - শৃঙ্খলা । সমৃদ্ধি থাকবে তেমনি ঐক্য সামাজিক ও আর্থনৈতিক স্বাধীনতাও থাকবে । তাঁর এই মনোভাব বশতই তিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান রচনাকালে সামাজিক সাম্যের দিকে নজর দিয়েছিলেন এবং সেই সময় তাঁর ভারতের নীপিড়িত মানুষের প্রতি সম্যক দৃষ্টি ছিল।

আম্বেদকর মনে করেছিলেন যে আইন হল একটা অস্ত্র যার দ্বারা সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংবিধান প্রত্যেক ভারতবাসীর মোলিক অধিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে। তিনি আরো ভেবেছিলেন যে আইন মৌলিক অধিকারের উপয় আক্রমণকেও প্রিহিত করবে। এজন্য সামাজিক অসামভকে প্রতিহত করা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংরক্ষণ প্রথা চালু করেচিলেন। এই সংরক্ষণের মাধভমে কিছু শ্রেনীর মানুষ নিরাপদে থাকবে - এটাই লক্ষ্য ছিল তাঁর । এর আওতাধীন ছিল কিছু পরিমাণ সামাজিক নিম্নশ্রেণী। তিনি সকল মানুষকে সমান অধিকারদেওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন।

এই অধ্যায়ে আমরা আম্বেদকর এবং গান্ধী উভয়ের ধারণাই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব । সমাজ থেকে বর্ণপ্রথা দূরীকরণে উভয়ের মতের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আলোচিত হবে । অস্পৃশ্যতার ধারণা বিতাড়ন করার পিছনে আম্বেদকরের যেসকল প্রচেষ্টা ছিল তাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে।

৪.১. অধ্যায় বিভাজন :

- সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে মহাত্মাগান্ধীর অবদান আলোচনা কর।
- শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধিজীর মত ব্যাখ্যা করা।
- গান্ধিজী ও আম্বেদকরের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার পার্থক্য আলোচনা করা।
- গান্ধিজী ও আম্বেদকরের মধ্যে অর্থনৈতিক ধারণা বিষয়ে মতের তুলনা করা।
- আম্বেদকরের মতে জাতি ও অস্পৃশ্যতার ধারণা ব্যাখ্যা করা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৪.২. মহাত্মা গান্ধী : সংক্ষেপে

মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী জন্ম গ্রহণ কচরেছিলেন কাথিয়াবাদের পোর বন্দরের ১৮৬৯ সলের ২রা অক্টোবর। তাঁর বাবা ছিলেন Pettystate এর একজন দেওয়ান। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই ধীর গতিসম্পন্ন ও লাজুক। যাইহোক, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীগত চিন্তাভাবনার মধ্যে ছিল বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞান এবং সত্যের অণুসন্ধান যা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আঠারো বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ডে ওকালাতি পড়তে যান। তার চার বছর তিনি ভারতে ফিরে আসেনএবং এখানে আইন বিষয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন বম্বেতে কিন্তু ততটা তিনি সফলতা পাননি। তিনি ১৮৯৩ সালেদর এপ্রিল মাসে জাহাজে করে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে গিয়েছিলেন নিজের কাজের জন্য। তিনি দক্ষীন আফ্রিকায় ২০ বছর কাটিয়েছিলেন এবং ওখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তিনি তাঁর রজনতিক জীবনের হাতিয়ার হিসাবে তিনি স্থাপন করেছিলেন সত্যাগ্রহ কে। এবং যখন তিনি ওখানে দেখলেন ভারতিয়দেরকে তুচ্ছের চোখে দেখা হোত এবং সেই সঙ্গে তিনি ওখানে ১৮৯৪ সালে NATAL indian Conras প্রতিষ্ঠা করলেন।

গান্ধিজী টলটয়ের দার্শনিক চিন্তাভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঐ চিন্তাভাবনার ওপর তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন যে, শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তটতা গুরুত্ব দেওয়া প্রবোজনন এবং কিভাবে তাদেদরকে দায়িত্বশিল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায়। তিনি শিশুদেরকে পেশামূলক শিক্ষার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিলেন ৮ ঘন্টা এবং ২ঘন্টা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন পড়াশুনার জন্য। শিশুরা মূলত ৬ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে তাঁর এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ খুবই আনন্দ উপভোগ করত।

দক্ষিণ আফ্রিকার তার সমস্ত চিন্তাভাবনা অর্জিত হবার পর তিনি ভারতে ফিরে এসেছিলেন ১৯১৪ সালে। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনা প্রথমত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শান্তিনিকেতনে এবং পরবর্তী দীর্ঘসময় ধরে সবরমতি আশ্রমে তাঁর দার্শনীক চিন্তার মূল বিষয়বস্তু -প্রতিস্থাপিত করেছিলেন। সেবকগ্রাম আশ্রমে গান্ধিজী শিক্ষা বভবস্থার পরিবর্তন তাগিতে করেছিলেন শুধুমাত্র তার মূল উদ্দেশ্য ছিল

স্বাধীনতাকে প্রতিস্থাপিত করা।

৪.২.১. মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ও কর্ম :

তিনি ভারত বর্ষের সংস্কারমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে ফিরে এসেছিএন এবং সেই সময়ছিল মূলত ভারতবর্ষের জাতিয় আন্দোলনের সময়। এ সময় সাধারণ জনগণ নরমপন্থীদের নীতির প্রতিআস্থা হারিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সাম্রজ্যবাদের শোষণ এবং দেশে দারিদ্র এবং জনমানুষের মধ্যে নিরাশার সংশয় চরম আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থায় জনসাধারণ নরম পন্থী নেতাদের নীতিগত ধ্যান ধারনাকে তারা পরিতভাগ করতে আরম্ভ করেন একই সঙ্গে চরমপন্থীরা নেতৃত্বদানকারী নেতার অভাব বোধ করেছিল । তা সত্ত্বেওচরমপন্থীদের মধ্যে নীতিগতভাবে ভাবধারাছিল সেই ভাবধারা জনগণকে উৎসাহিত করেছিল এবং সেইসঙ্গে সা্রাজ্য বাদি সরকারকে ভাবিত করে তুলেছিল। চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, তাঁরা তাদেদর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশনের পর। চরমপন্থী নেতাদের প্রথমতোই তাদের চিন্তাভাবনা ছিল তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কাশে কখনই আক্ষেপ করবেন না। অরবিন্দ ঘোষ এর মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যম সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মোলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। তার এই চিন্তা ভাবনায় দলের সমস্ত সদস্যরা গঠন করেছিল এবং সেইসঙ্গে তাঁদের মু্ লক্ষ্য ছিল স্বরাজকে প্রতিষ্ঠিত করা । চরমপন্থীদের অন্যতম বিশিষ্ট নেরা বিপিনচন্দ্র পালেরও ব্রিটিশ সরকারর নিয়োগ কানুনের বিরুদ্ধে ভিক্ষবৃত্তইর মাধ্যমে ন সরাসরি নিজেদের অধিকারকে প্রতিষঠিত করা এবং সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে সমূলে উৎপাটিত করা। নিজেদের দ্বচরাজকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রধান উপায় হল কঠোরমূলক ভাবে প্রসাশনীয় কতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঐসময় লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবের সামরীক অভিযানের যে ফলাফল হয়েছিল তা ছিল খুবই হতাশামূলক। তারমূল কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের দমনমূলক নীতি এই হতাশামূলক ফলাফলের জন্য তিনি তিনটি কারণ দেখিয়ে ছিলেন সে গুলি হল - দুর্বল, হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ

টিপ্পনী

এবং অস্পৃশ্যদের সমাজে স্থাপনা দেওয়া। সেইজন্য তনি এই তিনটি ইস্যুকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

এই সংকটমূলক সন্ধিক্ষণে দেশ অভাব বোধ করেছিল এক পথ পদর্শনকারী নেতারা এবং ঠিক ঐসময়েরই শ্রম পদর্শন কারীর মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর জবভাক্তিত্বের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক নরম পন্থি এবং চরমপন্থি সদস্যদের নীয়ে ভারতে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছিলেন। চরমপন্থীদের মাধ্যমে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের পার্লামেন্টে তিনি মহান শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন এবং সেই সময় তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের পূর্ণ সহায়তার বিতাড়িত দিয়েছিলেন।

তিনি G.K. Gokhla কে রাজনৈতিক গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ভালবাসা অহিংসা এই সমস্ত নীতিগুলিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মূলত সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য। এই পরিস্থিতিতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, নরমপ্রন্থীদের আবেদন নিবেদনেদর পদ্ধতি রাজনীতির মাধ্যমে স্বাধীনতাকে কখনোই প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। তিনি এই সময় চরমপন্থী নেতাষদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎপাটিত করতে হবে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করে। তিনি স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, প্রথা এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন ভারতবর্ষ তাদের পাশে থাকবে এবং তার পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসীর নিজস্ব সরকার এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাহায্য করতে হবে। কিন্তু ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের নতুন আইনয়ের সে অভিজ্ঞতা তা গান্ধীজিকে তিক্ত করে তুলেছিল। গান্ধীর তিক্ততা সবথেকে বেশী মাত্রায় ধারণ করেছিল যখন জালিওয়ানা বাগের যে হত্যা কান্ড হয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিতার বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেই মুহুর্তেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ল

টিপ্পনী

মহাত্মা গান্ধীর এই আন্দোলনে জাতিয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এবং এই আন্দোলনের পূর্বে ভারতবর্ষের কোন আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলোন রূপে পরিগণিত হয়নি । মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আন্দোলনের প্রস্তাব ছিল বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের পরিবর্তে ভারতীয় প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করা ইতিহাসে এই প্রথম বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপের নীতি গ্রহণ করেছিল।

টিপ্পনী

কংগ্রেসের অস্যোগ আন্দোলন শুরু করার পিছনে অনেক কারণ ছিল । মহাত্মাগান্ধির লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে সমগ্রভারতবাসীকে উজ্জীবিত করা এবং নিজেদের অধিকারকে উৎপাটিত করা কখনোই সম্ভব নয়। গান্ধীজি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করলে এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখলে তাহলে নিজেদের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় । সেইজন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের বরুদ্ধে ১৯২০ সালের আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নীতি একেবারেই মুছে গিয়েছিল। আর অন্যদিকে চরম পন্থীদের উদ্দেশ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুকর্নিরা তাষদের চুক্তি সম্পর্কে বাঁধার সম্মুখিন হচ্ছিল যা তাদের চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। ভারতিয় মুসলিমরা তুর্কিদের সামনে ব্রিটিশ ঐতিহ্য তুলে ধরে যা ব্রিটিশদেদর বিরুদ্ধে খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনা করেন । গান্ধিজীর এই আন্দোলনেকে সূচনা করেন । গান্ধিজীর এই আন্দোলনকে আরো জোরালো করে তুলেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে কংগ্রেস এই আন্দলোলনের বিরোধীতে করবে।

এই অসহযোগ আন্দোলন ১৯২০ সালে গন্ধিজীর দ্বারা ভারতিয় কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন লালা লাজপত রায় । যদিও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধীতা করছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, অ্যানি বেসান্ত, মদনমোহন মালব্য এং মহম্মদ আলি জিন্না, তবুও তিনি ৮৭৪ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ১৮৫৫ সালে বলবৎকরেছিলেন।

ভারতিয় কংগ্রেস দ্বার বলবৎ হওয়া অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বলা যায় তখনকার ভারতিয় এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতিয় মুসলীমদের প্রতি কর্তবভ থেকে চ্যুত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল যে প্রত্যেক অমুসলিম ভারতীয়দের আইনগত কর্তব্য হল মুসলিমদেরকে ভাই হিসাবে গণ্য করা এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয়গত ব্যবধানের অবসান করা। বিভেদহীন হিন্দু-মুসলিমের একতা দেখা গিয়েছিল ১৯১৯ সালের এপ্রিলমাসের ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে।

টিপ্পনী

৪.২.২. গান্ধিবাদ : ধারণা ও আদর্শ :

মহাত্মাগান্ধী ছিলেন একজন বাস্তবাদী ও প্রয়োগবাদী ভাবধারার মানুষ। যদিও তিনি চিলেন অন্যদের চোখে একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর বাস্তবাদী চিন্তাভাবনায় যা অর্জন করে ছিলেন এবং সেই অর্জনের ফলশ্রুতি হিসাবে উপাধী পেয়েছিলেন মহাত্মা। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের একজন ধর্মীয় মানুষ, তিনি কখনোই রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না। তাঁর কথায়, একজন রাজনীতিবিদ্ কখনোই ধর্মীয় মানুষ পরিনত হতে পারে না কিন্তু একজন ধর্মীয় মানুষের নীতিগত চিন্তাভবনা ধারা রাজনীতি বিদ্গণ প্রভাবিত হন। তিনি আরামদায়ক তত্ত্বের ওপর বিশ্বাস করতেন না। তাঁর সবকিছুর উপর মূলবৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবিদ্যা এবং রাজনৈতিক দর্শনের। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল চিন্তাভাবনা ছিল কিভাবে সাধারণ মানুষকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করা যায়। স্বরাজ , তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল বিষয়বস্তু ছিল। তার সমস্ত দর্শন চিন্তাভাবনার মূল উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে স্বরাজকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধিজির অহিংসার নীতি ভারতীয় রাজনীতির এবং আসাতিক জীবনের মূল অস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় শক্তি একেবারেই সমাহত কারণ - ভারতীয় শক্তির মধ্যে সবসময় লক্ষ্য পড়ে দুঃচিন্তার ছাপ, যা ককনোই ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজীত করতে পারেনা। সেইজন্যই গান্ধিজী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে অন্তঃভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশরা কখনোই আত্মসমর্পনে প্রস্তুত ছিল না। এই রকম সময়ে গান্ধীজি তাঁর সম্পূর্ণ নীতিগত শক্তি এবং জীবনকে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসর্গ

করেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা এতটাই মহান ছল যে, ভারতবর্ষের জাতিয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল । তিনিছিলেন রাজনীতিবিদ্‌দের মনিষি এবং তার এই মহাননীতিগুলি ভারতের অন্যান্য জাতীয় নের্তৃবিন্দের কাছে আদর্শ হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। হুমায়ুন কবিরের মতে, - "গান্ধীজি ছিলেন একজন বাস্তববাদ মূলয় চিন্তাভাবনার ছাত্র এবং তাঁর নীতিগত পদ্ধতিগুলি ছিল বৈজ্ঞানীক ব্যাখ্যামূলক" । জহরলাল নেহেরু ছিলেন গান্ধীজীর সমসাময়িক। গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর মতে - "তাঁর চিন্তা ভাবনাগুলি ছিল যুক্তিবাদীতা এবং দার্শনের বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গী"।

টিপ্পনী

৪.২.৩. গান্ধী এবং অর্থনীতি :

যখন ভারতবর্ষের অর্থনীতি প্রথম লিখিত আকারে তৈরি করা হয় তকন একজন মুখ্য অর্থনীতি বিশারদ Anjaria (1941 - 42) বলেন যে, গান্ধীর নাম গর্বের সাথে জায়গা করে নেয়। তিনি আরো যোগ করেন যে, এটা কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয় যে, আমরা গান্ধীজীকে অর্থনীতি বিশারদ বলতে পারি কিনা মূলত অর্থনীতি শব্দের দৃষ্টি কোন থেকে এই কথা বলা হয়।

গান্ধীজী হলেন ভারতীয় অর্থনীতির মূল ধারার জনক, যেমন - রানাডে ছিলেন। কারো কারো মতে গান্ধীজীর একজন অর্থনিতিবিদ হিসাবেই পরিচিত বেশি তিনি তাঁর আর্থনৈতিক রূপরেখাকে ইউক্লিডের সরলরেখার সঙ্গে তুলনা করতেন। কিন্তু তা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। একে ব্যাক্যা করা যেতে পারে এভাবে, যেমন - একটি পূর্ণ সরলরেখার মত (যা কখনো আঁকা সম্ভব নয়) গান্ধীজির অর্থনৈতিক মডেল একটি আদর্শ অর্থনৈতিক ক্রম বজায় রাখতে চায় যেখানে সাধারণ মানুষ একটু অন্যভাবে প্রেরণা পাবে। যদিও এটা আরো বোঝায় যে একটু সরলরেখা (যা আঁকা যায়) এবং অর্থনিতি যেমন জ্যামিতি, এক্ষেত্রে স্বীকার্য বিষয় আমাদের জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। আমারা অবশ্যই কি চাই তার নির্দিষ্ট পদ্ধতির একটা ছবি আমাদের কাছে আছে। এই উভয় বর্ণনাই সত্যকে ধরে রাখে।

গান্ধীজী একজন শিক্ষাবিদ না হলেও ভারতীয় জাতিয়তাবাদী সংগ্রামের

টিপ্পনী

একজন দক্ষ নেতা ছলেন। তিনি 'স্বরাজ' এর আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, যা স্ব-সরকারের নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল। 'স্বরাজ বলতে তিনি কেবল ঔপনিবেশিক শাসণের থেকে মুক্তির কথা বলেননি, তিনি এর মাধ্যমে স্ব-নির্ভরতা, আত্ম সম্মানের কথাও বলেছেন। এই সকল চিন্তার একটি দিক ছিল তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা।

গান্ধীজী তাঁর অর্থনৈতিক ধারণাকে বর্ণনা করেছিলেন সংগ্রামের আদর্শরূপে। এই দিক থেকে তাঁর আর্থনৈতিক ধারণা 'ইউটোপীয়' যদিও 'ইউটোপীয়' (Utopian) শব্দটি নির্দেশ করে 'অব্যবহারিক' অথবা 'অসম্ভব' কিছুকে। এই অর্থে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ধারণা 'ইউটোপীয়' নয়। গান্ধীজী তাঁর অর্থনেতিক ধারনাকে সমাজে প্রয়োগ করায় পক্ষপাতি ছিলেন। এই অর্থে তাঁর অর্থনৈতিক ধারণা প্রায়োগিক।

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ধারণা যে প্রয়োগবাদী, তা আমরা তাঁর লেখা থেকে বুঝতে পারি। গান্ধিজীর বেশিরভাগ অর্থনিতি বিষয়ক মত প্রত্যহ সংবাদপত্রে অথবা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ছাপা হত। 'ইয়ং ইন্ডিয়া', 'নবজীবন' এবং 'হরিজন' প্রভৃতি সংবাদপত্রে তাঁর মত ছাপাহত কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল বেশিরভাগ পাঠককে এই ব্যাপারে অবগত করাণো। এজন্য গান্ধীজী একজন সাংবাদিক হিসাবে ১৯২০ - ৩০ সালের দিকে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর লেখা খুবই সহজ, সরল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কাজের জন্য অত্যাধিক সরল করে দেখানো হত।

Louis Fischer নামে একজন আমেরিকান লেখক বলেছেন যে গান্ধিজীর মতাদর্শ ছিল শর্তাধিন। তিনি সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, এবং যা চিন্তা করতেন তা কাজে পরিণত করায় চেষ্টা করতেন। তিনি কখনোই তার মতকে শেষ মত হিসাবে ব্যক্ত করতেন না। তাঁর মত অনেকতা ত্রয়কম যে, 'তুমি কেবল শব্দ শোনেননি, তাঁর চিন্তা গ্রহণ করেছো এবার তুমি নিজে এর থেকে সমাধানের পথ বার কর।

গান্ধজীর অর্থনেতিক ধারণা মূলত তাঁর কিছু নির্দিষ্ট নীতিকে ব্যক্ত করে। মেসিনের ব্যবহার করে আধুনিককালে দ্রব্যের উৎপাদনকে বিরোধীতা করে গ্রাম্য শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য বভবহারের পক্ষ্যপাতি ছিলেন তিনি তাঁর যুক্তির পরিকাঠামো।

যেগুলো তিনি প্রথমে ধরে নিয়েছিলেন এবং যে সকল নীতি তিনি ব্যবহার করেছিলেন । সেগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজীর অর্থনীতি সম্পর্খে মত যেখানে অন্য সকলের থেকে তাকে আলাদা করে তা হল তার নতিক চিন্তা। তিনি মূলত চিন্তা করলেন যে নৈতিকতা ও অর্থনীতি পরম্পরা একই সূত্রে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উত্তরে তিনি বলেন যে, "আমি একথা স্বীকার করি যে, আমি অর্থনীতি নৈতিকতার মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারিনা।"

নৈতিক এবং অর্থনৈতিক মানদন্ড একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। সত্য অর্থনিতি কখনোই উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক আদর্শকে বিরোধীতা করে না, বরং তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে এবং আথনীতিকে বৃহত্তর অর্থে প্রদান করে থাকে। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক চিন্তা হল ভারতীয় ধর্মের মূল নির্যাস যা একইভাবে ধর্ম ও অর্থনীতিকে যুক্ত করে। গান্ধীজীর মতে যদি ধর্ম ও অর্থনীতিকে একইসাথে যুক্ত করা না যায় তাহলে হয় ধর্ম মিথ্যা বলে গণ্য হবে অথবা অর্থনেতক আদর্শ চরম স্বার্থপর হয়ে পড়বে । গান্ধীজীর মতে, এর কারণ হল অর্থনৈতিক আদর্শ, নৈতিক আলোচনাকে উন্মোচিত করতে ব্যর্থ হবে। ফলে অর্থনীতি অকেজো হয়ে পড়বে ফলে হয় এর অসদ্ব্যবহার হবে না হয় কোন নতুন নাহি তৈরি করতে ব্যর্থ হবে। এখানে কেবলমাত্র যে অর্থণিতিক নিবম তৈরি করতে ব্যর্থ হবে তানয়। সমগ্র জাতীকে এদর দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে। অর্থনীতিবিদরা মানুষের আচার আচরণের বিচার করার দিকে লক্ষ্য দিত এবং মূল্যায়ন করত যে কোনো জাতি তখনই সুখী হয় যখন তার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত হয়।

অর্থনিতির এই অসদ্ব্যবআরের জন্য গান্ধীজীর অর্থনীতির প্রতি বিশ্বাস কমে যায় এবং তিনি অর্থনীতির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কিভাবে তাকে উন্নত রূপদাব করা যায় তার কথা ভাবেন। অবশেষে তিনি উন্নত মানের অর্থনীতি উদ্ভাবন করা যায় তার কথা ভাবতে শুরু করেন।

এই বিশ্বাস হল গান্ধীজীর নৈতিক আদর্শের মূল স্বরূপ । অর্থনীতি ও নৈতিকতার সম্পর্ক উভয় দিকেই কাজ করে। অর্থনীতি যেমন নৈতিকতার দ্বারা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বোঝাই হয় তেমনি নৈতিকতায় সংস্পর্কে এসে অর্থনীতিও উন্নতমানের হয়ে ওঠে। নৈতিকতা বলতে গান্ধীজী বুঝিয়েছেন এটা কোন দার্শনিকের কাজ নয় এটা অবশ্যই সাধারণ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যেখানে মানুষের পছন্দ কম হবে কিন্তু উৎস বই হবে। এই জগতে এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না যার আর্থনৈতিক উৎস দিন দিন কম হতে ধাকবে। সকলে চেষ্টা করবে তাদের ভালো নৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষকে তার আর্থনৈতিক অচলবস্থা কাটিয়ে তুলতে। এই কারণে গান্ধীজি তাঁর সমগ্র জীবন। মানুষ ও পশু পক্ষীদের জীবন বাঁচানোয় সংকল্পে উৎসর্গ করন এবং বিভিন্ন নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন।

সামগ্রিকভাবে আমরা আনজেরিয়ার সাথে একটা একমত যে, গান্ধীজীর অর্থনৈতিক চিন্তা অণুসারে আমরা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক মতবাদের মূল্য নির্ধারণ করতে পারি না কিছু প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে। বরং এই প্রকল্পগুলো নিজেরাই তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হাজির করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজীকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অননুগামী বলে মনে হয়।

গান্ধীজী প্রধম থেকেই বিশ্লেষণী চিন্তাভবনা যা অবরোহ মাধ্যমের দ্বারা পাওয়া যায় তাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর লেখায় ইউক্লিড থেকে বহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায় এবং গ্যালিলিওর সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিকে তিনি সমাজবিজ্ঞানের আদর্শ বলে গন্য করেন। তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেন কারণ তা আদর্শ বলে গণ্য করেন। তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেন কারণ তা নৈতিকতা দ্বার যুক্ত নয়। তিনি বিমূর্ততা দ্বারা প্রাপ্ত বিশ্লেষণী বিদ্যাকে সমর্থন ককরতেন। অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নৈতিকতার প্রভাব বিরক্তিকর হয় না । কেননা নৈতিকতা আর্থনৈতিকতাকে স্বেচ্ছাচারী হতে দেয় না।

আবার গান্ধীজীর অর্থনৈতির উপর নৈতিকতার প্রভাব সম্পর্কির বক্তব্য গভীরভাবে পদ্ধতিগত ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদকে নির্দেশ করে। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে যৌথ মালিকানায় পক্ষপাতি ছিলেন না। হিন্দু ধর্মে খুব প্রাচীন কিছু নিয়ম আছে। তার মধ্যে কিছু নিয়ম সত্যিই প্রশসংনীয় এবং বাকিগুলো প্রশংসার যোগ্যনয়। যদিও রামায়ন ও মহাভারতের তার্কিক ও বিশ্লেষণীক সত্য বলা হয়েছে কিন্তু আমরা তাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলে মানিনা। তাঁর যদিও হিন্দু শাস্তরের প্রতি বিশ্বাস করতেন তার মানে এই নয়

যে তাঁকে প্রতিশাস্ত্রের প্রত্যেক অংশ সত্য বলছে মানতে হবে। তাঁর মতে বেদও এর থেকে মুক্ত নয়। গান্ধীজী বহুল পরিমাণে অপর ধর্মকে সমর্থন করতেন। গান্ধীজী মানুষের পরিনামবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত কর্মকে সমর্থন করতেন না তা সে ঐতিহাসিকই হোক আর সমাজতাত্ত্বিকই হোক। অবশেষে তাঁর মতে বিশেষ বিশেষ মানুষই সমাজের এক একটি একক বলে গণ্য ছিল।

টিপ্পনী

গান্ধীজীর মতে মূলত আর্থনৈতিক ধারা হল আত্ম গরিমাপূর্ণ চয়ন। তাঁর মতে আর্থনৈতিক বিদদের কাছে ফলাফলের পর্যালোচনা তা বিভিন্ন আচরণের কর্মধারার মধ্যষে যে কোনোটিকে বেছে নেয়। এখানে আর্থনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। গান্ধীজী ফলাফলের ধারণাকে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে আর্থনীতিবিদরা সেটাকেই নৈতিক ভাবেন যা অর্থনীতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। গান্ধীজীর মতে জীবন কোন সোজা রাস্তা নয়। জীবনে অনেক জটিলতা আছে। জীবন কোন ট্রেন নয়। যা একটি নির্দিষ্ট সমবে ছাড়ে এবং একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে। অথবা এটি কোন একটি পথ ধরে হিমালয়ে ওঠা নয়। অনেক সময় নিজের পছন্দ পরিষ্কার হয় না। তুলনামূলক ধর্ম কখনো সহজ পথ দেখাতে পারে না। এটি এমন কোন জঙ্গলে মানুষকে প্রবেশ করায় যেখানে কোন পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়। এবং সর্বদা মানুষকে পথ পাবার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়।

ব্যায়কারি আচরণ : চাহিদার সীমাবদ্ধতা :

চাহিদার সীমাবদ্ধতা' - এই ধারণাটি কল্যাণকারী অর্থনীতিতে গান্ধীজী প্রথম আনেন। এই রাষ্ট্র যেখানে একজন মানুষ তার মঙ্গল সাধন করতে পারে না। যেমন আর্থনৈতিক মতবাদ অনুযায়িও মানুষ তার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পুরণের মধ্য দিয়ে যদিও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কিন্তু আর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ এবং চাহিদার পুরনের মধ্যে তাকে যেকোন একটিকে বেছে নিতে হয়। যদিও আর্থনৈতিক দিক দিয়ে মনে হয় কামনা ও পরিতৃপ্তি, সুখ এবং মঙ্গল এগুলো একই অর্থবাহক কিন্তু গান্ধীজীর মতে এগুলো স্বতন্ত্র ধারণা।

প্রথমত, মানব কল্যান সকল প্রকার সুখ প্রদান করতে পারে না। মাদক দ্রব্য সেবন মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য সুখ দিতে পারে। কিন্তু তা কল্যাণকর নয়।

টিপ্পনী

দ্বিতিয়ত, সকল প্রকার কামনার পুরণ আমাদেরকে সুখ প্রদান করতে পারে না। কেননা প্রাথমিকভাবে মানুষের কোন ভালো কিছুর কামনা এবং তার ক্রিয়াকলাপ একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে আবদ্ধ নয় যাহাতে মানুষের চাহিদায় পুরণ তাকে সুখী করতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মন হল একটি বিরামহীন ডাক। এটি সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকে এবং যতই চাওয়া পূরণ হয় ততই মনের ক্ষুধা আরো বেড়ে যায়।

এই বাধাহীন কামনা মানুষকে দাসে পরিণত করে যেখানে চাওয়ার কোন শেষ নেই এবং তার ফলে নিজের মনের দাসত্ব করার চেয়ে বড় দাসত্ব আর নেই। আবার আত্ম অসংযম এবং বিরামহীন চাওয়া মানুষের বৃদ্ধিকে খ্যাতি করে। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে গান্ধীজির মতে সামাজিক আচরণ ও মানবসভ্যাতাকে বোঝা হয় মানুষের চাহিদার বহুলীকরণের মধ্য দিয়ে।

যদি কারো একটি ঘর থাকে তাহলে সে দুটি ঘর চায় তারপর তিনটি এবং অবশেষে বহু। এভাবে প্রত্যেক চাহিদা পরস্পর বর্ধিত হয়। এরকোন সীমা নেই। যে যত পথ তার ততই পাবার চাহিদা বাড়ে। গান্ধীজীর মতে এই ধরনের সভ্যতা মানুষকে দ্বিধান্বিত করে কোন কিছু পাবার প্রতি।

গান্ধীজী বলেন, মানুষের কামনা বাসনা মানুষকে দৈহিকভাবে উন্নত করে কিন্তু ত মঙ্গল আনতে পার না। বস্তুগত কামনা বাসনাকে দমন করার মধ্য দিয়ে মানুষ যে উদ্যম পায় তা তার বৈদ্ধিক সমাধানের চেয়েও উন্নত। এছাড়াও মানুষের কামনা বাসনাকে কমানোর জন্য গান্ধীজী অর্থনৈতিক আলোচনা ও নৈতিকতাকে একসাথে রাখতে চেয়েছেন।

ভারতে বহুসংখ্যকমানুষ কেবলমাত্র একবেলা খেয়ে বাচে। সেজন্য তাদের দিক থেকে ভাবলে। আগে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে হবে তারপর নৈতিকতার কথা বলা উচিত। একইসাথে তারা বলেন যে বস্তুগত অগ্রগতি নৈতিক অগ্রগতির সূচনা করে। গান্ধীজী এই মত সমর্থন করেন। যদিও তিনি বলেন যে কেবলমাত্র এই সকল মানুষদের ক্ষেত্রে যা মঙ্গলজনক তা সমগ্র বিশ্বের মানুষেরপক্ষে মঙ্গলজনক নাও হতে পারে।

গান্ধীজীর মতে, আমাদের এমন কোন নিয়ম বানাতে হবে যা সমগ্র বিশ্বের

মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হয়। কাজেই বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে আমাদের নৈতিক উন্নতিও দরকার।

তবে গান্ধীজী মানুষের চাইদার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কথা বলেছেন।যেমন তিনি প্রথম দিকের লেখাতে বলেছেন এখন নীতি প্রবর্তন করতে যা মানুষের প্রাথমিক চাহিদাকে পুরণ করবে।সকল মানুষ তার প্রাকৃতিক চাহিদা পুরণে পারদর্শী হওয়া উচিত। কেননা প্রত্যেক জীবেরই কিছু নিজস্ব প্রয়োজন আছে। যদিও প্রাকৃতিক চাহিদাগুলো বিভিন্ন জীবের মধ্যে ও পাল্টায়। কিছু প্রাকৃতিক চাহিদা গ্রামের মানুষদের জন্য নির্দেশিত, কিছু শ্রের মানুষের জন্য। তবে তিনি সাধারণভাবে গ্রামের মানুষের চাহিদার দিকে বেশি করে নজর দেন।

টিপ্পনী

ব্যবহারগত আদর্শ : স্বদেশী

'স্বদেশী' কথার অর্থ হল দেশে উৎপন্ন । স্বদেশী আন্দোলন ছিল যারা শহরাঞ্চলে বাস করে, বিশেষ করে তাদের দেশীয় দ্রব্য কেনা বিদেশী দ্রব্য বর্জনকার অভ্যাস তৈরির জন্য একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টা। তাদের আরো দাবি ছিল এই যে, মানুষ যেন গ্রামবাসীদের নিজের চরকায় তৈরি সুতো দিয়ে বানানো খদ্দরের পোশাক পরে। এই আন্দোলন করা হয়েছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতিয় কংগ্রেস দ্বারা। ১৯৩০ সালের দিকে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

গান্ধীজী স্বদেশী আন্দোলন করেছিলেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক উপযোগিতা লাভের জন্য নয় কিন্তু অন্যদিকে মানুষের নৈতিকতাকে যাচাই করার জন্য। এখানে সর্বপ্রথম যোগ্য নীতি হল প্রতিবেশিত্ব । একজনের নৈতিক কর্তব্য হল তার প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। যদিও একথা সত্য যে সমস্ত মানব জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে তবুও এই কর্তব্য বিভিন্ন স্তরে পাল্টায় । প্রত্যেকে তাদের দেশ ও মানবজাতির প্রতি কর্তব্য প্রতিবেশীর সাহায্য করায় মধ্যে নীহিত থাকে । কেউ তার পাশের প্রতিবেশিকে অভুক্ত রেখে দুরের মানুষকে সাহায্য করে না। এইটিই হল সকল ধর্মের সাধারণ নীতি এবং সত্য এবং মানবিক অর্থনীতি।

স্বদেশী আন্দোলনের উপর এই প্রতিবেশীত্ব নীতির একটি বিশেষ প্রভাব আছে । যেমন স্বদেশী দ্রব্য কেনা উচিত। সাধারণ মানুষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বস্ত্র না

টিপ্পনী

কিনে এই অঞ্চলে উৎপাদিত বস্ত্রই কেনা উচিত। সেই সময়ে জামা কাপড় আসত ম্যাঞ্চেষ্টার, জাপান, মুম্বাই, ও আহমেরদাবাদ থেকে যদি আমাদের বাংলা প্রাকৃতিকভাবে বাঁচতে পারে। পরিশ্রমের উপর নির্ভর না করে তাহলে সে নিজে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শষ্য নিজ খামারেই উৎপন্ন করতে পারবে। এই কারণে কলকাতায় তৈরি দ্রব্যকে পোরবন্দরের সাধারণ মানুষের তৈরি দ্রব্যের থেকে বেশি শৃঙ্খল বলে গণ্য হত।

প্রতিবেশিত্ব নীতি দুতি দেশের ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেম বলে গণ্য হয়। একজন প্রতিবেশির থেকে কোন কিছু কেনা উচিত, আমেরিকা থেকে সেই দ্রব্য না কিনে। কারো নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার সময় স্বদেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কেনা উচিত। কোন দেশের উন্নতির নীতি সেই দেশের বিভিন্ন অংশের বাসিন্দাদের দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য পছন্দের উপর নির্ভর করে। যযিও কোন কোন ভারতবাসী অন্যান্য দেশ থেকে আগত দ্রব্য পছন্দ করে তাদের উচিত এদেশীয় দ্রব্য গ্রহন করা। যেমন ভারত যদি ভালো চামড়া উৎপন্ন করে তাহলে ভারতবাসীর কর্তব্য হল দেশীয় চামড়ার জুতো ব্যবহার করা। ঠিক একইরকমভাবে ভারতবাসীর দেশীয় জামা-কাপড়, চিনি চাল অবশ্যই পছন্দ করা উচিত।

গান্ধীজী বলেন যে তুলনামূলক দাম বা গুনগত মান যাই হোক না তা ক্রেতার পছন্দের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু দেশাত্ববোধ শুধু এটা নয় যে জাতিয় পতাকা উত্তোলন করা এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় একসাথে থাকা। দেশাত্মবোধের কোন অর্থই থাকে না যদি না দেশে তৈরি দ্রব্য আমরা ক্রয় না করি।

যদি কোন দ্রব্য দেশে তৈরি না হয় তাহলে সেখানে দেশাত্ববোধের প্রশ্ন আসে না।

> "আমি মনে করি এটা আমাদের একটা রোগ যে অস্ট্রেলিয়ান আটা আমদানি করা তার ভাল গুণগত মানের জন্য কিন্তু আমার এতটুকুও দ্বিধাবোধ নেই স্কটল্যান্ড থেকে ওটমিল আমদানি করতে, কেননা ওটমিল ভারতে উৎপন্ন হয় না।"
>
> [ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮)

তেমনিভাবে এই নিয়ম প্রয়োজ্য হয় না ইংরেজ লিভার ঘড়ি, বই ও অস্ত্রপ্রচারের দ্রব্যের উপর। জাপানের লাকুয়ার ও অস্ট্রেলিয়ার পিন ও পেনসিল (সুইস ঘড়ি) ক্রয় উপর।

এই যুক্তি প্রযোজ্য হয় সকল প্রকার ঘরোয়া দ্রব্যের উপর গান্ধীজী ঘরোয়া দ্রব্য উৎপাদনের প্রতি মনযোগ দেন। তাদের মধ্যে খদ্দেরর স্থান ছিল গর্বের। যদিও প্রথমে এই আন্দোলনে দেশের মানুষকে খদ্দর ব্যবহার করতে বলাহত। ক্রমে শহরের মানুষ মিলে তৈরি সূতির পোশাকের বদলে খদ্দর পছন্দ করতে থাকে এবং ক্রমে বিদেশী দ্রব্য বয়কট করতে থাকে। এভাবে গান্ধীজী কেবলমাত্র ব্রীটিশ নয় সকল প্রকার বিদেশী কাপড় বর্জন করেন।

গান্ধীজী যে স্বদেশী দ্রব্য তৈরীর জন্য গ্রাম্য শিল্প বাকুটির শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার পিছনে ২ টো কারণ ছিল। প্রথমত যাতে শহরবাসীদের নজর গ্রামের দিকে পড়ে এবং শহরবাসীদের মনে যাতে গ্রামবাসীদের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগে এবং এর ফলে বিভিন্ন বাজার খোলা যায় যেখানে গ্রামের মানুষদের নিজ হাতে পন্য বিক্রয় হবে। এখানেপ্রথম কারণটি আছে প্রতিবেশিত্বের নীতি থকে এবং দেশাত্বোধের নীতি থেকে। গান্ধীজী এর মধ্য দিয়ে আরো একটি নৈতিক নীতি গড়ে তুলতে চাইলেন তা হল ঐতিহাসিক। গ্রামের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। এর জন্য তিনি শহরবাসীদেরকে দায়ি করেছেন। এর পুনরুদ্ধারের জন্য সকলে মিলে শপথ নিযে, 'আমরা সকলে এতকাল যে মারাত্মক ভূল কাজ করেছি তার জন শোকার্ত তা হল গ্রামবাসীদের দিকে নজর না দেওয়া এবং একমাত্র একটাই পথ আছে এর প্রায়শ্চিত্তের জন্য তা হল আমরা এদের পুরাতন শিল্প এবং কলা ফিরিয়ে দেয় এবং তাদের বাজার তৈরির ব্যবস্থা করা হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প ও উৎপাদনের মাপ :

ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনায় মূল বিষয় ছিল শিল্পায়নের সমস্যা। ভারতের শিল্পে বাধার ক্ষেত্রে অনেক মত আছে। অনেকের মতে এটা আর্থনৈতিক অপচয়। কিছুমতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক, মূলধন না ধাকায় শিল্পের বিকাশ হয়নি। কয়েকজন সরকারকেও দায়ি বলেন, কেননা সরকার এক্ষেত্রে উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সকলে এক বিষয়ে একমত যে দুর্ভিক্ষ ও গরীবত্ব ক্ষেত্রে শিল্পে উন্নতি সমাধান ডেকে আনতে পারে। অনেকের মতে পাশ্চাত্যের মত এদেশেও শিল্প আসা উচিত। ভারতের বেশিরভাগ আর্থনৈতিক লেখায় কিভাবে শিল্পের বিকাশলাভ সম্ভব। তার কথা বলেছেন । অন্যদিকে গান্ধীজী এই শিল্পের বিকাশ ভারতের লক্ষ্যনীয় বিষয় নয় বলেছেন তার লক্ষ্য ছিল স্বদেশি শিল্পের ব্যবহারে প্রাধান্য দেওয়া যা আধুনিক শিল্প স্থাপনের বিরুদ্ধাচারণ করে। মেশিনের ব্যবহার প্রচুর উৎপাদনে তিনি বাদ দিতে চাইতেন। টাঁর মতে মেশিনের ব্যবহারের ৩ টি মূল দিক আছে। প্রথমত মানুষের বা পশুর শ্রমকে নেবায় বদলে তাদেরকে দুরে সরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের শ্রমের সীমা আছে কিন্তু যন্ত্রের শ্রমের আয় তৃতীয়ত হল যন্ত্রের আণয়ন মানুষের শ্রমের বিনাসকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে মেশিনের ব্যবহার সামাজিক বা আর্থনৈতিক দিক থেকে চাই তা নয় বরং তথ্যপ্রযুক্তি আসার ফলে এটি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বলেন যে, আমি মেশিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে, কেননা এটি মানুষকে কর্মসংস্থানের পরিপন্থী, তিনি এটাও বলেন য মেশিনের অতিরিক্ত ব্যবআর বেকারত্ব বাড়ায়। যদি একটি মেশিন একশ জনেয় কাজ করে তাহলে একশ জনকে নিয়োগ করার কি দরকার ? কিন্তু এ বিষয়ে বলা যায় যে মেশীন আসার পর সেই শ্রমিকরা অন্য জায়গায় কর্মসংস্থান পেতে পারে, যদিও গান্ধীজী এব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহল ছিলন। তিনি এই বিষয়কে মাননি কেননা একবার চাকরি থেকে দরলে আবার চাকরি পাবার সুযোগ অনেক কম। সব জায়গায় সমান পরিমাণে সুযোগ পাওয়া যায় না।

গান্ধীজী আরো বলেন যে কোন শ্রমিকের একবার একজায়গায় কাজ ছড়ে দিলে অন্য জায়গায় কাজ পাওয়া শক্ত। এছাড়াও অন্য দেশের ক্ষেত্রে হয়ত কাজের স্থান অনেক বেশী কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে তাখুবই সামান্য কেননা এখানকার জনবসতি অনেক বেশী। কাজেই মেশিনের ব্যবস্থায় ভারতে বড় ধরণের বেকারত্ব তৈরি করতে পারে। তাছাড়া গান্ধীজীর দ্বিতিয় যুক্তি ছিল এরকম যে। শিল্পে যা তৈরি হবে তা মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে ধাকবে এবং শহরের প্রভাব গ্রামের উপর শহরের শিল্প প্রাধান্য পেতে থাকবে ফলে গান্ধীজীর স্বরাজের ধারণা বাস্তবায়িত হবে না। তা কখনোই গান্ধিজী মানেনি নি।

কারো কারো মতে গান্ধীজী যন্ত্রের ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন না। কিন্তু যন্ত্রের

অপব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন লেখায় তার ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে যন্ত্রের ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন না তা অনেকে ভুল বোঝেন। তিনি বলেন যে যন্ত্রের ব্যবহারে অর্থনতিক উন্নতি দ্রুত হয়। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে ভারতে আরো উন্নতি হতে পারে কিন্তু তাঁর মতে শিল্পের সম্প্রসারণ গ্রামের মধ্যে হোয়া উচিত। তাঁর মতে গ্রামে কাপড় উৎপন্ন, জামা কাপড় প্রভৃতি তৈরির কথা গান্ধীজী বলেছিলেন তার ধারণা শিল্পের গতানুগতিক ধারণা থেকে আলাদা। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে গান্ধীজী যন্ত্রের ব্যবহারকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এগুলি গান্ধীজীর মতে গ্রাম্য কুটির শিল্পে তৈরির হওয়া ভাল। কিছু কিছু শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহারকে মানলেও সার্বিকভাবে তা কার্যকর করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

টিপ্পনী

অছিতন্ত্র এবং শিল্পের সম্বন্ধ :

অছিতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজীর মত তাঁর সমাজতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্র ও সাম্প্রদাবিকতা শব্দদুটি গান্ধীর লেখায় একই অর্থে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। আমাদের 'ধনী' সম্পর্কে মত কি ? এই প্রশ্ন থেকে গান্ধীজী উক্ত ধারণা লাভ করেন। গান্ধীজী এর সাথে একমত নন যে যিনি ধনবান হবেন তার হাতে সবকিছুর মালিকানা ন্যস্ত থাকবে।

গান্ধীজীর মতে আমাদের পৃথিবিতে যা কিছু আছে তার প্রকৃত মালিক হলেন ঈশ্বের। ধনী ব্যাক্তিরা তাদের বুদ্ধির দ্বারা উক্ত সম্পদকে আরো বেশি করে - জাতির কল্যানের ক্ষেত্রে এটি হল উদ্দেশ্য। অছিতন্ত্র তাই নৈতিক কর্তব্যবোধের একটি আকার কিন্তু এটি অন্যদিকে দানশীলতা বা দয়াশীলতা থেকে কিছুটা পৃথক এবং এই দিক থেকে অছিতন্ত্র এগুলির বিকল্প।

অছিতন্ত্রের ধারণা এদিক থেকে স্ব-প্রবৃত্ত। এখানে ধনী ব্যক্তির উচিত নিজেকে একজন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ভাবা। একজন অছির উচিত তার পরবর্তি রক্ষকের হাতে এই ক্ষমতা দন করা এবং তাকে নির্বাচিত করা। যদি উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নেবার মত অবস্থায় না ধাকে তাহে মালিকের উচিত অন্য একজনকে নিযুক্ত করা। অছিতন্ত্রের ধারণা থেকে শিল্পগত সম্বন্ধের ধারণা নিঃসৃত হয়। যেখানে কেবল সংঘবদ্ধতা আএ কিন্তু বিবাদ নেই। একটি মিলের মালিক তার

শ্রমিকদের কেবল তার লাভের সহায়ক হিসাবে দেখতে পারে না, বরং সে তার উচ্যোগের সহকর্মী হিসাবে দেখতে পারে। গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে শিল্পে উন্নতি আসবে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায ও অগ্রগতি হবে। অছিতন্ত্র এটাও বলে যে লাভের একটা অংশের ভাগ শ্রমিকদের দেওয়া উচিত।

টিপ্পনী

গান্ধীজীর উক্তি :

নিচে গান্ধিজীর কিছু বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করা হল -

- গভীর ভাবে দোষী সাব্যস্থ থেকে উচ্চারিত একটি না, দয়া করে নিখুত একটি কথা বলার তুলনায় ভাল বা কারাপ বা দায় এড়ানো।
- একটি মানুষ যা চ্িতা করে সে তারই ফলাফল হয়ে ওঠে।
- একতি মানুষ যে সম্পূর্ণ নিরীহ, সে অন্যদের ভলোর জন্য নিজের বলিদানকরে এমন কি নিজের শত্রুদেরও এবং বিশ্বের বন্দিত্ব মোচন করে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ।
- একটি জাতির সংস্থৃতি সেই জাতির মানুষের হৃদয় এবং আত্মার মধ্যে বসবাস করে।
- একটি নীতি হল অনিত্য ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য দায়ি, যখন এটির ভালত্ব প্রতিষ্ঠাতা ধারণ করে তখন ধর্মপ্রচারের ভাববাশী মনোভাবের দ্বারা অনুসৃত হয়।
- এটি প্রধান কাজ হল অভিব্যক্তির পরিপূর্ণতা, আমাদের মত অপরিপূর্ণ ব্যক্তি পরিপূর্ণতার চর্চা করতে পারে না। আমরা প্রতিটি মুহূর্তকে তার আপসের চর্চার মধ্যে কল্পনা করি নি।
- একটি ধর্ম কোন ব্যবহারিক জীবনের রাখে না এবং তা অন্য কোন ধর্ম তা সমাধান করতে সাহায্য করতে পারে না।
- একটি শপথ একটি পরিপূর্ণ ধর্মীয় কাজ যা কখনো আবেগের দ্বারা মাপা যায় না, এটি শুধুমাত্র মস্তিষ্কের বিশুদ্ধ জন্য গৃহীত হয়, ঈশ্বরকে সাক্ষী করে।
- একজন দুর্বল ব্যক্তি হয় দুর্ঘটনার দ্বারা একজন সাহসী কিন্তু অহিংস ব্যক্তি নীতিবিরুদ্ধ হয় তা নিছকই দুর্ঘটনা।
- কর্মপ্রকাশ করে অগ্রাধিকার।
- মানুষের গঠনগত সহজাত প্রবণতা হল চিন্তা তার চেয়ে কর্ম কম প্রয়োজনীয় নয়।

- সমস্ত সন্ধি দেওয় এবং নেওয়ার ওপর নির্ভর করে কিন্তু কোন দেওয়া এবং সেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে কোন সন্ধির ক্ষেত্রে আত্মসমর্পন গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য সব কিছুই দিতে হয়, নেওয়ার কিছু নেই।
- বিশ্বের সমস্ত ধর্মই অন্য মর্যাদার দিক ধেকে বিসদৃশ এরা সম্মিলিত ভাবে প্রচার করে যে জগতে কোন কিছুই নিত্য নয় কিন্তু সত্য।
- সবসময় লক্ষ্য হল চিন্তা, এবং কর্মের সাদৃশ্য সর্বদা আপনার চিন্তার বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, এবং তাহলেই সব কিছু ভাল হবে।
- ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অণেক অপকর্মের মধ্যে ইতিহাস সে দিকেই দৃষ্টিপাত করবে যা সর্বপরি সমগ্র জাতিকে অস্ত্রশস্ত্র থেকে বঞ্চিত করছে।
- বহুবিধ প্রচারের কারণে একটি সত্য হয়ে ওঠে না, তেমনি একতি ত্রুটি সত্য হয়ে ওঠে না কারণ কেউ এটা দেখে না।
- একটি চোখ চোখের জন্য শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্ব শেষ পর্যন্ত অন্ধ তৈরি হয় এবং একটি অনুশীলনের ওজন অনুশীলনের স্বরের থেকে অনেক বেশি দামি।
- একজন ভিরু প্রেম প্রদর্শনে অক্ষম, এটা সাহসীদেরই বিশেষ অধিকার।
- একজন ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনার ফসল, সে যা চিন্তা করে, তাই হয়ে ওঠে।
- একজন ব্যাক্তি তার চিন্তা ভাবনার ফসল, সে যা চিন্তাকরে, তাই হয়ে ওঠে।
- একজন ব্যক্তি যে সম্পূর্ণনিরীহ, যে অন্যের ভালর জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার্য করে।
- একটি জাতির সংস্কৃতি তাদের ব্যাক্তিদের হৃদয় এবং আত্মার মধ্যে বিরাজ করে।
- একটি নীতি পরিবর্তিত হতে অস্থায়ী ধর্মমত দায়ি কিন্তু যখন এটা ভাল রাখে তখন তা গভীর ভাবে অনুসৃত হয়।
- একতি ধর্ম কোন ব্যবহারিক জীবনের হিসেব রাখে না, এবং অন্য কোন ধর্ম তা সমাধান করতে সাহায্য করে না।
- তাদের মিশন একটি অখন্ড বিশ্বাস দ্বারা বহিস্কার একটি নির্ধারিত প্রফুল্লতা একটি ছোট গরীবের ইতিহাস অবশ্যই পরিবর্তন করতে পারেন।
- একটি শপথ একটিপরিপূর্ণ ধর্মীয় কাজ যা কখনো আবেগের দ্বারা মাপা যায় না এটি

টিপ্পনী

শুধুমাত্র মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতার জন্য গৃহীত হয় ঈশ্বরকে সাক্ষী করে।

- একজন ব্যাক্তি দুর্বল হয় দুর্ঘটনার দ্বারা একজন সাহসী কিন্তু অহিংস ব্যাক্তি নীতি বিরুদ্ধ হয় দুর্ঘটনার দ্বারা।
- কর্ম প্রকাশ করে অগ্রাধিকার।
- মানুষের গঠনগত সহজাত প্রবণতা হল চিন্তা, তার চেয়ে কর্ম কম প্রয়োজনীয় নয়।
- ভীতির ব্যবহার আছে কিন্তু ভীরুতার কিছু নেই।
- সমস্ত সন্ধি দেওয়া এবং নেওয়ার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কোন দেওয়া নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়।
- বিশ্বের সমস্ত ধর্ম সম্মিলিত ভাবে প্রচার করে জগতের কোন কিছূ নিত্য না কিন্তু সত্য।
- সর্বদা লক্ষ্য হল চিন্তার সঙ্গে শব্দ ও কর্মের সাদৃশ্য চিন্তা বিশুদ্ধ হলে সবকিছু হবে।
- ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অপকর্মের মধ্যে ইতিহাস সে দিকে দৃষ্টিপাত করবে যা সমগ্র জাতিকে অস্ত্রশস্ত্র ধেকে বঞ্চিত করছে।
- একটি চোখ, চোখের জন্য শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্ব শেষপর্যন্ত অন্ধ পরিণত হয় এবং একটি অণুশীলনের ওজন অণুশিলণের স্বরের থেকে অণেক বেশি দামি।
- মৃত্যুভয় শূন্যতা আমাদের বীর এবং ধার্মীক উভয়ই তৈরি করে। বীর হতে চাওয়া মানে ধর্ম বিশ্বাসী হওয়া।
- প্রথমে তারা তোমাকে অবএলা করবে তারপর তারা তোমার ওপর হাসবে, তারপর তার তোমার সাথে যুদ্ধ করবে, তারপর তুমিই জয়ী হবে।
- আমার মতে প্রত্যেকতি নিয়মই শ্রেণী বদ্ধ যা জণমতকে অমাণ্য করে।
- স্বাধীনতার কখনো কোন মূল্য হয় না, এটি জীবনের শ্বাস। এতা ছাড়া মানুষ কি করে বাঁচবে?
- নম্রতা আত্মবলিদান এবং দাক্ষিণ্য কোন ধর্মেরই এক চেটিয়া অধিকার নয়।
- গরিমা জনিত মিথ্যার একজনের লক্ষ্য পৌছোবার প্রচেষ্টা নিহিত এবং এটায় পৌছানোয় নয়।

টিপ্পনী

- ঈশ্বর আছে যদিও সমগ্র বিশ্ব তাকে অস্বিকার করে। সত্য দাড়ায় যদিও তাকে কোন জনতা বা ব্যাক্তি সমর্থন না করে। এটা তার নিজস্ব তা বজায় রাখে।
- ঈশ্বর সত্য,আমার কাছে মূল্যহীন সম্পদ, হয়তো আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাই হতে পারে।
- সুস্থ অস্তুষ্টি অগ্রগতির প্রস্তাবনা।
- আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কোন কারণ নেই যা আমাকে হত্য করতে প্রস্তুত।
- সৎচুক্তি প্রায়ই অগ্রগতির ভাল লক্ষণ হয়।
- আমি প্রত্যেকের মধ্যে সমতায় বিশ্বাস করি, সাংবাদিক ও চিত্রকরদের ছাড়া।
- আমি বিশ্বের প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যে বিশ্বাস করি।
- আমি বিশ্বাস করি একজন মানুষ নিরস্ত্রভাবে মৃত্যু বরণের ক্ষেত্রে একজন সাহসী সৈনিক।
- আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদর্শন করতে চাই না। আমি বর্তমান সম্পর্ক কথা বলতা আগ্রহী ঈশ্বর আমাকে চলে যাওয়া সময়ের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয় নি।
- আমি মহিলাদের জীবন্ত আত্মহুতি ও আত্মদানের প্রতিমূর্তি হিসেবে যুক্ত করি।
- আমি জানি, একজনের হৃদয় থেকে ঘৃনা করা কষ্টসাধ্য। এটা কেউ নিজের প্রচেষ্টায় ঠিক করতে পারে না।কেবলমাত্র ঈশ্বরের অণুকম্পার দ্বারা এটি সম্ভব।
- আমি যীশুখ্রিষ্টকে পছন্দ করি কিন্তু খ্রীষ্টানদেরকে নয়। কেননা খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টের মত নয়।
- আমি কেল মানুষের ভালো দিকটা দেখি। যেহেতু আমি নিজে দোষমুক্ত নই সেজন্য অন্যদের আমি দোষমুক্ত বলে ভাবি না।
- আমি হিংসার বিষয় কেননা যখন এটি কারো ভলো করে। সেই ভালো হল ক্ষণিকের, কিন্তু যখন মন্দ করে তা হল চিরকাল স্থায়ী।
- আমি প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যর যোগকে স্বাগত জানাই। কিন্তু এটি পাশব শক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ঠিক নয়।
- যদি সমগ্র বিশ্বে আমরা শান্তি আনতে চাও এবং যদি আমরা সত্যই যুদ্ধের বিরুদ্ধে

টিপ্পনী

যুদ্ধ করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই শৈশব থেকে শুরু করতে হবে।

- আন্তরিকতা হল অকৃত্রিম তোষামোদ।
- মৃদুভাবে তুমি বিশ্বকে আন্দোলিত করতে পার। নৈতিক দিক দিয়ে সমষ্টি গত নিয়মের প্রয়িজন এখানে নেই।

টিপ্পনী

- মানুষ সামাজিক জীব। কাজেই পারস্পরিক নির্ভরতা হল খুব গুরুত্বপূর্ণ।
- অসহনীয়তা নিজেই হল এক প্রকার এবং এটি জাতির উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ।
- আমি বুঝতে পারি না মানুষ কিভাবে একজনকে অপমান করে নিজেকে সম্মানিত বোধ করে।
- যদি কারো মনে হিংসা থাকে তাহলে তার সহিংস হওয়া ভালো। কিন্তু মনে হিংসা রেখে অহিংসা নীতি গ্রহণ করা ঠিক নয়।
- আমি নিজে বিশ্বাস করি যে নিরামিষ আহার আত্মার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- ভালো কাজ করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। তা যতই সামান্য হোক না কেন।
- মানুষ যেমন অন্যের দেহের মধ্যে বাঁচতে পারে না, তেমনি কোন দেশ অপর দেশের মধ্যে বাঁতে পারে না।
- এমন ভাবে বাঁচো যেন তুমি কাল মৃত্যুবরণ করলেও মানুষ তোমাকে সারাজীবন মনে রাখে।
- মানুষ তখনই মহৎ হয় যখন সে মানুষের জন্য কিছু মহৎ কাজ করে।
- পুরুষ কখনোই নিঃস্বার্থভাবে ক্রিয়া করার দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় উৎকৃষ্ট হতে পারবে না। কেননা প্রকৃতি তাদের এভাবেই তৈরি করেছে।
- শয়ন করা আগে মানুষের উচিত তার হিংসাকে ভূলে যাওয়া।
- মানুষের প্রকৃতি খারাপ নয়। ভালোবাসার কাছে মানুষের খারাপ স্বভাব হার মানে।
- নৈতিকতা কখনো ভেবেচিন্তে আসে না। মানুষের ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই তা আগত হয়।

- মানুষ তার সর্বাপেক্ষা মহত্তম ধারণা লাভ করতে অসমর্থ যখন সেতার প্রত্যহ চাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। মানুষের সুখ প্রকৃতই শাসনের মধ্যে নীহিত থাকে।

- যুদ্ধের সময় নৈতিকতা নিষিদ্ধ থাকে।
- যে কোন কিছুর মূল ভিত্তি হল নৈতিকতা এবং নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল সত্য।
- নৈতিকতা আসে আমাদের হৃদয়ের বিশুদ্ধতা থেকে।
- আমার জীবনই হল আমার বার্তা।
- আমার ধর্মের মূল ভিত্তি হল সত্যতা এবং অহিংসা। সত্যতা হল আমার ঈশ্বর। আর ঈশ্বরকে পাবার মূল পথ হল অহিংসা।
- আমার অনুমতি ছাড়া কেউ আমাকে আঘাত করতে পারবে না।
- অহিংসা এবং সত্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এবং একটি থেকে অপরটিকে অনুমাণ করা যায়।
- অহিংসাকে যখন ইচ্ছা পরা বা খোলা যায় না। এটি হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর অবস্থান ও হৃদয়ে।
- অহিংসা এবং সত্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এবং একটি থেকে অপরটিকে অনুমান করা যায়।
- অহিংসা হল বিশ্বাসের বস্তু।
- মানবতা স্থাপনের অণভতম হাতিয়ার হল অহিংসা।
- আমার বিশ্বাসের প্রথম বিষয় হল অহিংসা। এটি আমার ধর্মেরও শেষ বিষয়।
- শান্তি হল তার নিজস্ব পুরস্কার।
- হিংসার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম আকার হল দারিদ্রতা।
- প্রার্থনার অর্থ হল নিজের অযোগ্যতা ও দুর্বলতাকে মেনে নেওয়া।
- প্রার্থনা কোন বৃদ্ধ মহিলার অলস চিত্তবিনোদন নয়। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এটা হল কোন কর্মের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার।
- কোন হৃদয় নেই তার থেকে যেখানে কেবল হৃদয় আছে কিন্তু শব্দ নেই - এমন হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা করা ভালো।
- প্রার্থনা হল প্রভাতের চাবিকাঠি এবং অন্ধকারের শিকল।
- দুরদর্শিতার সবকিছুর জন্য নিজস্ব ময় আছে। আমরা কখনোই ফল আকাঙ্খা করতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পারি না। আমরা কেবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি।

- নিজস্ব জীবনের বিশুদ্ধতা হল উত্তম শিষ্য গঠনের অপরিহার্য শর্ত।
- ধর্ম জীবনের থেকে ও বড়।
- অধিকার যদি ভালোভাবে কৃত কর্তব্য থেকে না আসে তাহলে তা কোন কাজে আসে না।
- আত্ম সম্মান কোন বিবেচনাধীন নয়।
- দৈহিক সম্বন্ধের থেকে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ অনেক বেশি কার্যকরী।
- দৈহিক ক্ষমতা থেকে শক্তি আসে না। এটি আসে অবদমিত ইচ্ছা থেকে।
- যে সকল সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয় নিজ ইচ্ছা থেকে তা সর্বাপেক্ষা উদার।
- নিজেকে জানার সর্বাপেক্ষা উন্নত পথ হল অন্যের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করা।
- সকল ধর্মের মূল এক। কেবল তাদের পদ্ধতি ভিন্ন।
- কোন ভালো মানুষ সকল বস্তুর বন্ধু হয়।
- জীবনের সবথেকে মহৎ উদ্দেশ্য হল ভালোভাবে বাঁচা।
- সত্যতা কখনোই অপরের প্রতি হিংসাকে অনুমতি দেয় না।
- নারীর চরিত্রই হল তার সবচেয়ে বড় অলঙ্কার।
- দুর্বলরা কখনোই ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমাশিলতা হল সকলের গুণ।
- পৃথিবীতে অনেক মানুষ ক্ষুধার্ত, কেননা ঈশ্বর তাদের সামনে রূটি হয়ে দেখা দেয় না।
- দুর্বলরা কখনোই ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমাশীলতা হল সকলের গুণ।
- মানুষের প্রয়োজন মেতানোর মত বস্তু যথার্থই পৃথিবীতে আছে কিন্তু লোভ মেটানোর মত বস্তু নেই।
- জীবনের কোন দামই নেই যদি না তা পুরোপুরি ভালো হয়।
- যারা কিভাবে চিন্তা করতে হয় তা জানে তাদের কোন শিষ্যকের দরকার হয় না।
- যারা মনে করে ধর্ম রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম নয় তারা ধর্ম কি তা জানে না।

৪.২.৪. গান্ধিজীর জীবনদর্শন ও মানবিক ঐক্যতা :

মানুষেদর জীবনের উদ্দেশ্য হল কল্যাণ ময় নীতিকে উপলব্ধি করা। এবং প্রত্যেকের কর্তব্য হল এই অণুযাবী জীবনকে গঠনকরা। এইভবে তিনি ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা এবং ঐক্যতাকে খুঁজে পেয়েছেন। যদি আমরা ইচ্ছা করি নিচুতাকে ভেহো ফেলতে যা মানুষের জীবনকে ঘিরে রয়েছে সেখান থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি উচ্চ ভাতৃত্বের দ্বারা এবং মানুষের প্রতি মানুষের সম্মানের দ্বারা। যেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠানের কোন সহযোগিতা নেই। মানুষের কোন বাজে ইচ্ছা প্রতিকুলতার বিষয়দ্ধে পোষণ করা উচিত নয়। তাদের বরং ধৈর্য্য সহকারে উচিত তাদের বিপক্ষকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা যাতে একটি নতুন ক্রম গঠিত হয় যেখানে মানুষ ঐক্যের মধ্যে বিচরণ করতে পারে।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক মানুষের মন প্রচুর পরিমাণে ঐতিহ্যগত এবং এখনও পরস্পর সম্পর্কিত কর্ম নিয়ে বংশগত সুত্রে সে বহন করে নিয়ে আসছে। সুতরাং সে আদিম মানিষের চিন্তাধারা থেকে অবশ্যই উন্নত। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে উন্নতি মানুষ শিক্ষার ক্ষেত্রে তৈরি করেছে - বংশগত সূত্রে নয়। এখানে চিন্তাবিদদের একটি অভগ্ন উন্নতির কথা ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে যারা মনুষ্য জাতিকে উচ্চ থেকে আরও ইচ্ছা কে ও উদ্দেশ্যকে পোষণ করায়। এই ঘটনাটি নিজ থেকেই সৃষ্ট এবং একা উচ্চনীতির সৃষ্ট ফল যা মানুষের ভাগভকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গান্ধিজীর এইরকম লেখাতে এইধরনের বিশ্বাস সুসপষ্ট ভাবে নিহিত রয়েছে।

আত্মশৃঙ্খলা এবং আত্ম পরিশুদ্ধি :

গান্ধীজী নিজেকে দয়া, বিশুদ্ধতা, ত্যাগ এবং সেবার প্রতিমূর্তি রূপে উপস্থাপনা করেছিলেন। তিনি খুব উচ্চাঙ্খা পোষণ করতেন যে ভারতবর্ষে একদিন সমাজতান্ত্রিক কর্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে নিম্নবর্গীয় কৃষক খেটে খাওয়া মানুষেরা যথার্থরূপে উন্নয়ন এবং স্বাধীনচিন্তার উদ্‌গাতারুপে প্রতিস্থাপিত হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অহিংস ও সত্যবাদিতার ওপর। গান্ধিজী নিরন্তর চেষ্টা করতেন হিংসার বিফলতা জনগণকে বোঝাতে। তাছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের প্রতি তার উপদেশ ছিল যে হিংসা কখনও আন্তর্জাতিক বিতর্কের সমাধান হতে পারে না। তিনি ভিরু মানুষকে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভয়হীন ইসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যারা স্বাধীন ভারতের দাবীকে সাহসের সঙ্গে দাবী করতে পেরেছিল। কারাগার এবং ফাঁসিকাঠ যেগুলি জনগণের মনে ভয়ের বাতাবরণ তৈরী করত। সেগুলিকে তিনি পবিত্র কুঠিরে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তিনি জগনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসুদ্ধিত গুণ শিখিয়েছিলেন। সম্মিলিত কর্ম্ম যেকোনো সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়কে অতিক্রম করতে পারে। এই বীশ্বাস তিনি তেরী করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় নীতিকে রাজনীতির সাথে পরিচয় করান এবং আধ্যাত্মিকভাবে রাজনীতির সাথে সফলভাব স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

গান্ধিজীর মতবাদের অণুপ্রেরণার কারণ :

গান্ধীজী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধ মহাবীর জৈণ্য এবং সমান্তরালভাবে প্রাচীন ভারতের হিন্দু দার্শনিকতার সাহায্যে যেমন - উপনিষদ, বেদ - বেদান্তর, মহাভারত এবং অন্তিমে ভগবত গীতার গভীরতার দ্বারা উপনিষদ বৌদ্ধ, জৈন থেকে তিনি অহিংসার ধারণা শিখেছিলেন। ভগবতগীতা তাকে একজন কর্মযোগী হতে অণুপ্রেরণা জাগায়। যার অর্থ একজন লোক সে স্বার্থহীন ভাবে কাজের প্রতি নিবেদিত। আত্ম উপলব্ধি এবং অনিচ্ছাকৃত উপস্থাপনা হল একজনের কর্তব্য যা মূলন নীতি এটি তিনি গীতা থেকে গ্রহণ করে। গান্ধিজী ভীষণভাবে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম দ্বারা অণুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি যিশুখ্রীষ্টের সহজসরল জীবন দর্শন দেখে অবিভূত হন তিনি নির্দিষ্ট ভাবে বাইবেলের মনোমুগ্ধকর বাক্যের দ্বারা চমৎকৃত হন। যেখানে লেখা আছে পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়। যিশু খ্রীষ্টের অহিংসার প্রতি ঘোষণা তাকে ভীষণভাবে উদবুদ্ধ করে। তদুপরি গান্ধিজী সত্যাগ্রহের ধারণা খ্রীষ্টান শিক্ষা থেকেই গ্রহন করেন। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন যে এটা হল একটা নতুন টেষ্টামেন্ট নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উন্নতির ধর্মপদেশ যা সত্যিভাবে আমার মধ্যে সার্থক ও সত্যাগ্রহের মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলেছে।

মানব সেবাই ছিল গান্ধীজীর দর্শন :

তিনি বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য হোল এই জ্ঞানলাভ করা। সামাজিক, রাজনতিক এবং ধর্মীয় কাজে তিনি আর্মোদিগকে পরিচালিত করেছেন। সকল কাজেই তাঁকেই খোঁজ করা দরকার। তিনি

বিশ্বাস করতেন মানব দেহই হচ্ছে ঈশ্বরের মন্দির। মানব সেবাই হচ্ছে তাঁকে পূজা করা।

ধর্ম:

গান্ধীজী বলেন ধর্ম ছাড়া জীবন বৃথা যেখানে ধর্ম নেই সেখানে জীবন নেই - নেই কোন নীতি। স্বামীজীর মতে তিনি বলেন কোন ধর্মকে ঘৃনা করা ঠিক নয়। যেমন একটি গাছের বহু শাখা প্রশাখা থাকে তেমনি 'মানবিকতাই' ধর্ম বহুজন বহুভাবে প্রচার ও প্রসার করছেন মাত্র। প্রত্যেক মানুষের রীতি নিজের ধর্মকে যেম শ্রদ্ধা করবে ঠিক তেমনি অপর ধর্মকে ও শ্রদ্ধা করবেই ঘৃনা বা নিন্দা করবে না।

সামাজিক কর্ম:

সমাজের সকল কর্মে সকলের আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন সামাজিক ক্রমে গান্ধিজী কি অনুধাবন করেছিলেন ? তার উত্তরে বলা যায় সমাজে বসবাস কারি প্রতিটি মানুষের সহযোগিতা মূলক প্রচেষ্টা থাকা দরকার যা সত্যের উদঘাটনে সাহায্য করবে। একটা সহযোগী মূলক প্রচেষ্টা ভালোবাসা একে অপরের প্রাত সহযোগিতা মূলক ভাবনা পোষণ করে যা সমস্ত ঘৃণীত চিন্তাকে দূর করে। এইভাবে সমাজের সত্যের দ্বারা ও অহিংসার দ্বারা ক্রম গঠিত হয় যার নাম ভালোবাসা।

শোষণ সে যেকোন রূপেই হোক না কেন ? সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনতিক অথবা ধর্মীয় সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় কারন এটা মনুষ্যত্বের স্বর্গীয় মর্যাদাকে বিনষ্ঠ করে। অর্থনৈতিক ভাবে এবং সামাজিক গঠনগত ভাবে সমাজ বিকেন্দ্রীভূত শিল্প ও কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেককে স্বাধীন হতে হবে তার নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে কারণ নির্ভরতা অনাশ্রয়তাকে ডেকে আনে এবং অনাশ্রয়তা শোষণ কে তরান্বিত করে। তথাপি একজন কে নির্ভর হতে হয়। যেহেতু এটি সহযোগিতা মূলক জীবন সবাই দাবি করে। এই দৃশ্যে সমাজে বাস্তবে পরিণত করতে গান্ধিজী শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন ল তিনি এর উপর চল্লিশ বছর ধরে অনেক প্রচেষ্টা ও পরিক্ষা করেছেন। তার ধারনা তখনকার দিনে মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় ১৯৩৭ সালে যখন সমস্ত ভারতের জাতীয় শিক্ষাগত আলোচনা সভাটি ওয়াধাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন সর্বসম্মতিক্রমে গান্ধিজীর ধারণা কমিটির দ্বারা গৃহীত হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শিক্ষার অর্থ :

শিক্ষার অর্থ বলতে আমি বুঝি শিশু এবং মানুষের মধ্য থেকে সর্বক্ষেত্রের উন্নতি - দেহগত মন এবং আত্মার উপলব্ধি এইভাবেই গান্ধিজী শিক্ষার ধারনাকে সজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি পুনরায় আবার বলেছেন 'সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ একতা সমতা যুক্ত উন্নতি যা মানুষের মধ্য থেকে নির্গত হয়। যা একটি শিশুরা মধ্যে কুন্ডলীকৃত ভাবে স্থিতি শক্তি হিসাবে আবৃত থাকে। যা শিক্ষার দ্বারাই বর্দ্ধিত হয় দেহগতভাবে, মানসিক এবং আত্মিক দিক থেকে। এইভাবেই একটি পূণাঙ্গ মানুষের দৃশ্য গোচরিত হয়। প্রথমেই জোর দেওয়া হয়েছে দেহের উপর এবং আমার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটা হল একটি ব্যবহারিক কাজ যা বুদ্ধিগত উন্নতির দ্বারা একজন অর্জন করে। কিন্তু বৌদ্ধিক সাফল্য শিক্ষার প্রাথমিক অথবা শেষ নয় এটা হল একটি মধ্য অবস্থান। স্বতন্ত্র মানুষ তথাপি তার মধ্যে সবধেকে ভালোগুণের আবির্ভাব ঘটায়। সমস্ত উন্নতি, সমস্ত নিজস্ব অগ্রগতি সবই সত্যের জন্য বা আধ্যাত্মিক নীতির উপলব্ধিতা প্রতিটা মানুষের ক্ষেত্রে বর্তমান। এই শিক্ষা শুধুমাত্র শিশু বা যুবকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা সমস্ত জীবনের বিবরণ। এটা হল শিশু ও মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। সুতরাং শিক্ষা ততোসময় সম্পন্ন হয় না যত ক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ ভাবে নিজের সত্তাকে না বুঝতে পারে। শিক্ষা হল জীবনের মধ্যে জীবনের জন্য। শিক্ষা অবশ্যই শিশুকে অবশ্যই যত্নবান করে তোলে।

গান্ধিজী এবং আদর্শবাদ বা ভাববাদ :

শ্রী এম এস প্যালের কথাতে 'তাঁর লেখা পড়ে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে গান্ধিজী একজন কোন আদর্শবাদী। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিপালন দেখে আমরা বুঝতে পারি তার প্রকৃতির মধ্যে আদর্শবাদ গভীরভাবে বদ্ধমূল।

আত্মোপলব্ধিই হোল জীবনে মূল লক্ষ্য এবং এটা শুধুমাত্র অর্জন করা যায় সকলকে সেবা করারমধ্যে দিয়ে নিজেকে পার্থিব জগৎ থেকে না সরিয়ে রেখে। টাঁর ধর্মে আত্মার প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে।

গান্ধিজীর আদর্শবাদ এই শব্দগুলির দ্বারা প্রতিফলিত হয় 'অনেকদিন আগে আমি যখনটলস্টয় ফার্মে অল্পবয়স্ক জেলে মেয়েদের শিক্ষা দিতে গিয়েছিলাম তখন

আমি উপলব্ধি করেছিলান আত্মার প্রশিক্ষণ নিজের দ্বারাই সম্ভব। আতআর উন্নতি সাধন করতে গেলে চরিত্রের উন্নতি সাধন দরকার এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্মসাধন করতে হবে তাহলেই আত্মউপলব্ধি জাগ্রত হবে , এটা আমি মনে করিয়ে এই ভাবেই অল্পবয়স্কদের উন্নতি ঘটানো সম্ভব। কিন্তু যে প্রশিক্ষণে আত্মবিশ্লেষণ আলোচিত হয় না সেটি কোন কাজেই লাগল তা ভবিষ্যতর পক্ষে ক্ষতি কর।

টিপ্পনী

গান্ধিজী এবং প্রয়োগবাদ :

এম এস প্যাটলের মতে গান্ধিজীর প্রয়োগ বাদে শিক্ষা হল সুন্দর। শিক্ষা মূল্যের প্রাথমিক নৈপূণ্যতা হল সহ সমন্বয় এবং শিক্ষার সঙ্গে জীবনের এক নিবিড় সম্পর্ক এই শিক্ষা কর্মের দ্বারাই সম্ভব এবং এটি সতন্ত্র প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব। এবং বারবার পরীক্ষার দ্বারা সত্যিকে আবিস্কার করা সম্ভব। শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধিজী প্রয়োগবাদের কিছু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

- তিনি জীবনটা পরিক্ষামূলক পদ্ধতির দ্বারা গড়ে তুলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বা সত্য হল তাই যা যাচাইযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনী বলতেন সত্যের অন্বেষণই আমার পরীক্ষা।
- একজন প্রাজ্ঞ প্রয়োগবাদীর মতো গান্ধীজী প্রচার করেছিলেন যে একজন শিশুর তবে জীবনদর্শন থেকেই শিক্ষা গ্রহন করা উচিত।
- একজন প্রয়োগবাদীর কর্মপরিকল্পনা ও গান্ধীজীর প্রাথমিক পরিকল্পনার মধ্যে অনেক সাধারণ সদৃশ্যতা দেখা যায় । প্রকল্পের মতোন একটি প্রথমিক শিল্পকে সামাজিকীকরণ করতে হলে বিভিন্ন কর্মের মধ্যে যোগদান করতে হবে যেখানে সামাজিক সম্পর্কগুলি বিদ্যমান।

৪.৩. গান্ধীবাদি হিসাবে আম্বেদকর :

আম্বেদকর এবং গন্ধীজী উভয়েইতাঁদের কাজ শুরু করেছিলেন সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক অন্যায় দূর করার জন্য এবং তাঁরা দুজনেই কিছু সময় একসাথে কাজও করেছেন। আম্বেদকরের সময় গন্ধীজী ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির একজন নামকরা বভাক্তিত্ব এবং গান্ধীজী যেহেতু নীপিড়িত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে

টিপ্পনী

আসতেন এবং সমাজ থকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা বলতেন, তাই গান্ধীজীর প্রতি আম্বেদকরের সমর্থন জানিয়েছেন। ধর্ম সম্পর্কে প্রাচীন মত হল তিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস ল কিন্তু আম্বদেকর ধর্মের ধারকরূপে ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতিকে মানতেন না। গান্ধীজীর মত মানুষের নৈতিকতাই হল আম্বেদকরের ধর্ম সম্পর্কে ধারণার মূল কেন্দ্র। উভয়েই ছিলেন মানবদরদী । দিও তাঁরা উভয়ে অস্পৃশভতাকে বিপরীত দৃষ্টিকোনথেকে দেখছিলেন। গান্ধীজীর ন্যায়পরতা ও মানবিক মর্যাদাসম্পর্কে জ্ঞান ছিল । কিন্তু এটি তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা নর্ধারিত ছিল। অপরদিকে আম্বদেকরের ছিল নিজ জিবনের অস্পৃশ্যতা ও জাতি বিভাগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। তিনি নিজে অস্পৃশ্যতার স্বীকার ছিলেন। তাই আম্বেদকরের কাজের একটা অন্য দৃষ্টিকোন ছিল।

যদিও গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরোধীতা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে এর সাথে জাতিভেদ প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। ১৯২২ সাল পর্যন্ত গান্ধীজী জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করতেন। আম্বেদকর গান্ধীজীর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বলেছে - "আমি মনে করি হিন্দু সমাজ নিজ পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ। কননা এটি জাতিভেদ প্রথার উপর ভিত্তি করে গঠিত। এর একটি ভিত্তি হল প্রাথমিক শিষ্যা। অপর ভিত্তি হল রাজনৈতিক চিন্তা। জাতিভেদ প্রথা বিচার সংক্রান্ত কাজের সমাধতান করে। আমি বিশ্বা করি যে দুটি বিপরীত জাতির মধ্যে ভোজের আয়োজন অথবা বিবাহ সম্পাদন জাতিয় ঐক্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

গান্ধীজীর মতে - বর্ণ কোন অসাম্যকে ইঙ্গীত করে না। তাঁর মতে সকল বর্নই সমান কেননা তারা সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তু। তাঁর মতে অস্পৃশ্যতা হল ভারতের উন্নতির পথে প্রধান বাধা। গান্ধীজী বলেন অস্পৃশ্যতাকে বিতান না করলে স্বরাজ সম্ভব নয়। স্বরাজ হল আমাদের দেশবাসীর যা সর্বাপেক্ষা কাছের , তার জন্য স্বাধীনতা। গান্ধীজী লিখেছিলেন - "অস্পৃশ্যতা হল এক ধরনের ফ্যাকাশে বস্তু যা একটি সম্মানজনক সমাজের বাইরে অবস্থিত।"

একজন কার্যকরী সমাজসংস্কারক হিসাবে গনা্ধীজী দেখিয়েছিলেন যে আন্তঃবর্ণের মধ্যে ভোজন অথবা বিবাহ সম্প্রদানের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে অণুভব করেন যে এর সমাধান কেবলমাত্র মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব।

অণ্যদিকে আম্বেদকর মনে করেছিলেন যে জাতিভেদ প্রথা হল হিন্দুর প্রধান দুর্বলতা। তনি মনে করতেন যে এই জাতিভেদ প্রথা কেবলমাত্র শ্রমের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। এটি শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন থেকে এসেছে। যা মানুসষের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি হিন্দুদেরকে সংগঠিত হতে ও নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে বাধা দেয়। আম্বদকর কিছু সামাজিক ব্যাধি যেমন - সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, এবং বিধবার অবিবাহ প্রভৃতি এর থেকে এসেছে। জাতিভেদ প্রথার মধ্যে যে অসাম্য লুকিয়ে ছিল আম্বেকর তার বিরোধী ছিলেন। আম্বেদকর দেখলেন যে গান্ধীজী জাতিভেদ প্রথা মেনেও পরে তার বিরোধীতা করেন কিন্তুধ পুনরায় বর্ণ ব্যবস্থাকে ধরে থাকেন। আম্বেদকরের মতে বর্ণ ব্যবস্থা হল জাতিভেদ এর সমকক্ষ । কারে কারো মতে, 'জাতি সম্পর্কিত প্রশ্নে আম্বেদকর সরাসরি গান্ধী, নেহেরু এবং অন্যান্য সমাজবাদীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আম্বেদকরের মতে গান্ধীজীর জাতিকে নতুন রূপদান এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কর্মসূচী ভালো হলেও স্বধর্ম পালন হল অলীক।

আম্বেদকর মানুষের মন থেকে অস্পৃশ্যতা এক ধরনের আলাদা বস্তু - এই ধারণাকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন । তিনি অস্পৃশ্যতাকে ধংস করার জন্য নিজস্ব কৌশল অবলম্বণ করতে বলেছিলেন এবং কেউ যাতে তার অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ধারণাকে গান্ধীজীর ধারণার সাথে গুলিয়ে না ফেলে তার জন্য সর্বদা চেষ্টা করার প্রয়োজন।

উপচরিউক্ত বক্তব্য থেকে এটি পরিষ্কার যে গান্ধীজী ও আম্বেদকর উভয়েই অস্পৃশ্যতার দূরীকরণ চেয়েছিলেন এবং একটি সুস্থ সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যদিও তাদের উভয়ের সমাধান ছিল ভিন্ন প্রকারের।

গান্ধীজীর মত :

- অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।
- বর্ণ ব্যবস্থাকে চালুরাখা যা তাঁর কাছে জাতিভেদ প্রথা থেকে ভিন্ন।
- তিনি মনে করতেন যে উচু শ্রেণীর মানুষের মনোভাব পাল্টালেনীচু শ্রেণীর মানুষের মনোভাব ও পাল্টাবে। তাই তিনি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা মানুষের মনোভাব পাল্টানোর কাজে লাগিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আম্বেদকরের মত :

- জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ।
- আম্বেদকর মনে করতেন জাতিভেদ প্রথা বেদ থেকে এসেছে ফলে তিনি শাস্ত্রকে মানতে নিষেধ করেন।
- তিনি একটি শক্ত আইন চেয়েছিলেন যাতে কেউ জাতিকে কখনো খারাপভাবে ব্যবহার না করতে পারে।

গান্ধীজীর মতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের একটি মূল পথ লুকিয়ে ছিল আমাদের মনোভাব পাল্টানোর মধ্যে তিনি মনে করেছিলেন যে হিন্দুদের মনোভাব পাল্টায় তাহলে জাতিভেদ প্রথা লোপ পাবে।

গান্ধীজী ও আম্বেদকরের মতে অর্থনৈতিক আদর্শ ও তাঁদের মতপার্থক্য :

গান্ধীজী গ্রামে অর্থনীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বরাজ দাবী করেছিলেন। তিনি মনে করেন যে স্বরাজ হল গণতন্ত্রের মূল একক । অণ্যদিকে আম্বেদকর মনে করেছিলেন যে জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণের জন্য গ্রাম ত্যাগ করা উচিত। তাঁর মতে মগরায়ন হল মূউল উত্তর জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে। গান্ধীজী চেষ্টা করেছিলেন, কিভাবে ভারতের গ্রামকে সুসজ্জিত করা যায়। এর জন্য তিনি গ্রামে সংরক্ষণের উপর জোর দেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, যদি ভারতের গ্রাম ধ্বংস হয় তাহলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অনভদিকে আম্বেদকর ভেবেছিলেন যে গ্রাম্য জীবনে দুর্দশায় অন্যতম মূল কারণ হল অস্পৃশ্যতা।

আবার গন্ধীজীর মতে শিল্পায়ন হল সাধারণ মানুষের শ্রমের দ্বারা অপরের উন্তিসাধন। তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীন ভারতে শিল্পায়নের জায়গায় বিকল্পভাবে কুটির শিল্প তৈরি হোক তাতে সাধারণ মানুষের জীবনধারণে স্বাচ্ছন্দ আসবে। অণ্যদিকে আম্বেদকর শিল্প গড়ার পক্ষ্যপাতী ছিলেন, কেননা শিল্প হল তাঁর কাছে কৃষিতে অসফলতার বিকল্প হিসাবে কাজ করবে। যদিও গান্ধীজী ও আম্বেদকর উভয়েই ভারতে কৃষিকাজের বিফলতার কথাজানতেন এবং এর প্রতিকাও দাবী করেছিওলেন। কিন্তু

গান্ধীজী চেয়েছিলেন কৃষির পাশাপাশি কুটির শিল্পকে আর আম্বেদকর চেয়েছিলেন কৃষির পাশাপশি শিল্পায়নকে। তবে আম্বেদকর শিল্পের জাতিয়তাকরণ চাননি। তিনি চেয়েছিলেন যে অর্থনীতির উপর নির্ভর করে সম্পত্তির মালিকানা যা অন্ততপক্ষ্যে কৃষিকে ও শিল্পকে সম্মান দেবে। অণভদিকে গান্ধীজীর মতে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সম্পত্তির মালিকান প্রদান করা উচিত। এখানেই আম্বেদকর ও গান্ধীজীর অর্থনতিক ধারণায় মূল পার্থক্য।

টিপ্পনী

৪.৪. অস্পৃশ্যতা :

অস্পৃশ্যতা হল এমন একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা বি. আর. আম্বেদকরের মতে সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। তাই তার অধিকাংশ লেখা হল আস্পৃশ্যতা ও জাত ব্যবস্থার উপর। তাঁর মতে হিন্দু ধর্মের প্রধান দুর্বলতা হল এর জাতব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্যতার ভিত্তিতে বিভাজন বা পৃথকীকরণ। জাতব্যবস্থা কোন বস্তুগত বিষয় নয়, এটি হল একটি মানসিক ধারণা। তিনি মনে করেন এই জাতব্যবস্থার ভিত্তি ভারতবর্ষে সুদৃড় হওয়ার পিছনে ধর্মেরত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই জাতব্যবস্থা যে হিন্দুদের মধ্যে শুধুমাত্র কাজের বা শ্রমের বিভাজন এনেছে তা নয়, তাদের অসংগঠিত ও নীতিহীনতার দিকে নিয়ে চলেছে। বিগত সময় ধরে এই জাতব্যবস্থা ও জাতিসচেতনতা তাদের মধ্যে চেতনার সমহচার করেছে। এই জাতভিত্তিক বিভাজনের বিরুদ্ধে নৈতিকতা ও উচিতবোধের প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই আম্বেদকরও এই জাতব্যবস্থার ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ছিলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সমাজের মধ্যে জাতব্যবস্থা বিরোধীতা করে সমাজে গণতান্ত্রিক আদর্শ যেমন, স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে গেছেন। এর জন্য তিনি সমাজের মধ্যে যে বর্নব্যবস্থা রয়েছে তাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন। আম্বেদকর বীশ্বাস করেন যে একমাত্র জাতব্যবস্থার উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রকৃত সামাজিক সংস্কার সাধিত হতে পারে। এই উচ্ছেদ হল সামাজিক সংস্কারের মূল কেন্দবিন্দু।

সাধারণভাবে বলা হয় যে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ ব্যবস্থা সমাজে সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি নানান মতামত ব্যক্ত করেছেন।

টিপ্পনী

তবে জাত এর বিভিন্ন সংজ্ঞা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাবো :

১) ক্রমোক স্তরে বিন্যস্ত বিভাজিত সমাজ।

২) খাদ্যাভাস ও সামাজিক চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রণ।

৩) বিভিন্ন স্তরের মানুষের ধর্মীয় নানা বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪) জীবিকা বাছাই এর ক্ষেত্রে সমস্যা।

৫) বিবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ।

আর এই জাত ব্যবস্থা সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের মধ্যে প্রাধান্যকারী মনোভাব নিম্নস্তরের মানুষের মন্তব্য তাদের প্রাধান্য স্বীকার করার মানসিকতা এনেছে।

হিন্দুধর্মে জানতব্যবস্থা চারভাগে বিভক্ত। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দুইভাগে বিভক্ত - Touchable এবং Untouchable । সমাজের উচ্চতর শ্রেনী ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য নিম্নস্তরের মানুষের উপর নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা নিষেধ আরোপন করে। আর এই নিম্নস্তরের মানুষেরা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত । তাই এই জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা প্রকৃতিগত ভাবে ভিন্ন।

আম্বেদকরের মতে অস্পৃশ্যতা হল জাতিব্যবস্থার একটি বৈশীষ্ট্য বা হিন্দুদের মনবে গভীর ভাবে প্রোথিত। এটি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মানুষকে আচ্ছন্ন করেছে। যা ভিত্তইতে উচ্চবর্নে জন্ম বা নিম্নবর্নে জন্ম প্রভৃতি বিষয় সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ।এটি প্রথমে একটা জটিল ছিল না। কিন্তু দিনে দিনে সমাজের মধ্যে ধর্মীয় ভিত্তিতে এই জাতিভেদ ব্যবস্থা তার গভীর শিকড় ঢুকিয়ে দিয়েছে আর তাই তা দিনে দিনে জটিল ও ভয়ঙ্কর ও অমানবিক হয়ে উঠেছে।

আম্বেদকর তার বাল্যবয়সেই এই জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার সঠিক অর্থ অনুধাবন করেছিলেন। হিন্দু সমাজে উঁচু, ও নিচু জাতি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তার এটিই হল তার দর্শন ও কাজের মূল উৎস। তিনি সমাজের সকল মানুষকে জাতি ধর্মের এই অমানবিক ও অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে ভারতিয় সমাজকে মুক্ত করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবাস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেখানে সকল মানুষ তার প্রয়োজনীয়

সুযোগসুবিধা পাবে ও তাদের নিজস্ব ও সঠিক মর্যাদা বজায় থাকবে।

আম্বেদকর উপলব্ধি করেছিলেন সমাজের মধ্যে সমস্ত অন্যায়ের মূল কারণ হল এই অস্পোঋশ্যতা। কারণ নিচু জাতের মানুষের মানবিক ও অধিকা ও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সমাজ দমিয়ে রাখতে চায়। আম্বেদকরের মতে সমাজেরমধ্যে এই বৈষম্য রয়েছে শুধুমাত্র তার জন্মের ভিত্তিতে অর্থাৎ যে কোন জগতে জন্মেছে। আবার তাকে সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত জায়গা ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। তার যাতাযাতের উপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা হয়। এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ তাদের সামাজিক মানুষ হিসাবে গণ্য করে না। তার মতে যদি বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে বিবাহ, তাদের একসাথে খাদ্যগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এই বৈষম্য কিছুটা হলেও কমতে পারে।

সিদ্ধান্ত :

যদিও আমরা সিদধান্ত করতে পারি নে গান্ধিজী ও আম্বেদকর মূল লক্ষ্য একই ছিল। তাদের কৌশল ছিল ভিন্ন। দুজনই অসপৃশ্যদের দেবতা দুজনই ভারতিয় সমাজে অস্পৃশ্যজাতির জন্য চিন্তা করেছেন। এনারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সমাজ গঠন করতে চেয়েছেন। আম্বেদকর কাজ করেছেন নিজের জাতির জন্য এবং গান্ধীজী চেয়েছেন উচ্জাতির সঙ্গে সম্পর্ক করে সমাজ গঠন করতে পরবর্তি সময়ে আম্বেদকর পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য গান্ধীজীর অবদান স্বীকার করেছেন। গান্ধীজির উদাহরণ যে আম্বেদকর সংবিধানের Drafitiny Committee সভাপতি ছিলেন। আম্বেদকর এবং গান্ধীজীর উভয়েরই স্বপ্ন ছিল এক শক্ত একত্রিত ভারতবর্ষ। এই দুজন মহৎ নেতাকে আমাদের দেশের জন্য শ্রদ্ধা জানাই।

৪.৫. প্রশ্নাবলী :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. কে গান্ধীজীর ধারণা ও চিন্তাভাবনার দ্বারা অনুপ্রানীত হয়েছিলেন এবং কিভাবে?

২.শিল্পায়নের বিপরীতে গান্ধীজীর কি যুক্তি ছিল?

৩. গান্ধীজীর দানশীলতা সম্পর্কে ধারণা ও কর্মমুক্তি সম্পর্কের ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?

টিপ্পনী

৪. গান্ধীজী কেন আলাদা নির্বাচকমন্ডলীর ধারণাকে মানেননি ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. গান্ধীবাদি অর্থনিতির ধারণা আলোচনা কর।

২.গান্ধীজীর অছিতন্ত্র সম্পর্কে মত ব্যাখ্যা কর।

টিপ্পনী

৩. অস্পৃশ্যতা ও দলিত শ্রেণীর প্রতি গান্ধীজীর ভাব যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৪.. গান্ধী ও আম্বেদকরের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনেতিক চিন্তার যে বৈষম্য ছিল তা আলোচনা কর।

NOTES

টিপ্পনী

NOTES

টিপ্পনী